সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

- বর্ষ : ৬৪
- সংখ্যা : ২৩-২৪
- বার : সোমবার

- ০৬ মার্চ- ২০২৩ ঈসায়ী
- ২১ ফাল্গুন-১৪২৯ বাংলা
- ১২ শা'বান- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল-কুরআনের জ্যোতি** ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **সিয়াম : দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৫
- **প্রবন্ধ :**
  - **নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ৮
  - **হারাম উপার্জনে হালালের পরিণতি**
    মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ১২
  - **তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**
    মূল : সউদ বিন আব্দুল মুহ্সিন আস সায়েদী
    অনুবাদ : আহমাদ রফিক- ১৭
- **আলোকিত জীবন :**
  - **মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী : তাফসীর চর্চায় তাঁর অবদান**
    প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী- ২০
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - **ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-জুলায়খার কাহিনী ও আমাদের সমাজ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৫
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৭
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - **তিন বন্ধুর গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ**
    আব্দুর রউফ- ৩০
- **মহিলাজগৎ :**
  - **বিভিন্ন ধর্ম সভ্যতায় নারী ও তার অধিকার**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ৩১
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - **মুসলিম জাতির ভারত শাসন**
    মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম- ৩৬
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৮
- **স্বাস্থ্য ও সচেতনতা** ৪০
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

সম্পাদকীয়

দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সফল হউক!

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সহীহ দ্বীনের ঝাণ্ডাবাহী এ দেশের একমাত্র প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ ইসলামী সংগঠন। মূলত এটি প্রচলিত রাজনীতি মুক্ত একটি দা'ওয়াতী ও সংস্কারবাদি সংগঠন। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে মানুষের 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের সংশোধনের লক্ষ্যে এ সংগঠন নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। দুনিয়াবী স্বার্থ ও লোভ-লালসা মুক্ত এ সংগঠনের একামাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ সংগঠন যথাসম্ভব সুশৃংখল এবং নিয়ম-তান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব কর্মসূচির অন্যতম হচ্ছে– ***"দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহা সম্মেলন"****। আসন্ন* ***৯ ও ১০ মার্চ-২০২৩ ঈসায়ী*** *তারিখে* ***দু'দিন ব্যাপী*** *এ মহাসম্মেলন* ***"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"****-এর নিজস্ব জায়গা কাইচাবাড়ী রোড, বাইপাইল, আশুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ।*

আমাদের ইচ্ছা ছিল এবার পবিত্র কা'বার কিংবা মসজিদে নববীর ইমাম ও খত্বীবকে প্রধান মেহমান করে মহাসম্মেলন করা। সে লক্ষ্যে আমরা সউদী ধর্মমন্ত্রণালয়ের সম্মতিও পেয়েছি। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতি ও প্রটোকল ব্যবস্থাপনায় কিছুটা সময় ক্ষেপণ হওয়ায় এবং এবারের উম্মুক্ত সম্মেলনের মৌসুম শেষের দিক বিবেচনায় আমাদেরকে স্বল্প সময়ের মধ্যে ***"দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহা সম্মেলন-২০২৩ ঈ."*** *বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে। এতদ্হেতু জমঈয়ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংগঠন হওয়ায় কম সময়ের মাঝে আমরা বিদেশী অনেক জ্ঞানী-গুণী, প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ'গণকে এ সম্মেলনে অতিথি হিসেবে পাচ্ছি আল-হামদুলিল্লাহ। সউদী আরব, মিশর, জর্ডান, ভারত ও নেপাল হতে সালাফী আলেম এবং জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ অংশ নিচ্ছেন। তাঁদের আগমন আমাদের মহাসম্মেলনকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা একান্ত আশাবাদী। আর এসব মান্যবর বিদেশী মেহমান পেতে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত বিশেষত মাননীয় সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী (হাফিযাহুমুল্লা-হ)-এর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ জমঈয়ত নেতৃবৃন্দকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন!*

এবারের সম্মেলনে হাজার হাজার জ্ঞান পিপাসু মুসলিমগণের বড়ো জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। প্রায় ৫০টি সাংগঠনিক জেলা হতে জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ, আলেম-উলামা ও সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও ওলামায়ে কিরাম বিষয়ভিত্তিক সারগর্ভ মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন; যাতে থাকবে জ্ঞান পিপাসু ও সত্যান্বেষী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় 'ইল্মী খোরাক। তাঁরা এ সম্মেলন থেকে অবিমিশ্র ও খাঁটি ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা নিয়ে নিজ নিজ জেলা ও এলাকায় ফিরে যাবেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দা'ওয়াহ ও তাবলীগের কাজে মনোনিবেশ করবেন। ফলে জমঈয়তের দা'ওয়াতী কার্যক্রম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং বিগত সময়ের চেয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ হবে। আর এটাই হচ্ছে মহা সম্মেলন আঞ্জাম দেওয়ার বড়ো উদ্দেশ্য।

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অবিচল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন ধীর-স্থিরভাবে তার সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে আসছে। প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ সংগঠন হওয়ায় এটির গণভিত্তি সু-গভীরে প্রোথিত। তাই এ সংগঠনই নৈতিক অধিকার রাখে এ দেশের জনগণকে বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে কেবলমাত্র জমঈয়তের পতাকা তলে সকলকে সম্মিলিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাতে। আহলে হাদীসগণের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের কথা যে যত সুন্দর করে বলুক না কেন, তাতে তেমন কোনো ফল হবে না। কেননা, ঐক্য মূলের দিকে হয়; শাখা বা বিচ্ছিন্ন পথে নয়। সে জন্যে আমরা বলি– কারো মুখরোচক কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। জমঈয়ত আছে এবং থাকবে ইন্শা-আল্লাহ এবং এ জমঈয়তই গোটা আহলে হাদীস সমাজের নেতৃত্ব দেবে। আর সদাসর্বদা জমঈয়তই সকলকে ঐক্যের প্লাটফর্মে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাবে।

এ বারের মহা সম্মেলনে থাকবে অনেক গুলো বুকস্টল, ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্র, সুপেয় পানী ও পর্যাপ্ত সেনিটেশন ব্যবস্থা। থাকবে এক ঝাঁক নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক। খাওয়ার জন্য থাকবে হোটেল এবং জমঈয়তের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বল্প মূল্যের খাবারের সু-ব্যবস্থা। আটচল্লিশ বিঘার নিজস্ব ক্যাম্পসে শোভা পাবে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ভবন, ইয়াতিমখানা ভবন, মডেল মাদ্রাসা ভবন ও মসজিদ। গাছগাছালী ও পত্রপল্লবে ঘেরা এ বিশাল ক্যাম্পাসে আসলে মন জুড়াবে সকলের। অতএব আসুন! আমরা সবাই মিলে এ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলি। চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিই খাঁটি তাওহীদের নির্মল আলোকচ্ছটা। দা'ওয়াতের সমীরণে সুরভিত হোক এ মহাসম্মেলন। ❑

আল-কুরআনের জ্যোতি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :

۞ ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

☆ "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও রোযাকে অপরিহার্য, কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করা হলো যেন তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩)*

۞ ﴿اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

☆ "এটা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির হয়, তার জন্যে অপর কোনো দিবস হতে গণনা করবে; আর যারা সক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে; তবে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার জন্যে কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাকো তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪)*

۞ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

☆ "রমযান মাস, যার মধ্যে 'বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও (হক্ব ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন। অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন রোযা রাখে এবং যে ব্যক্তি অসুস্থ বা মুসাফির তার জন্যে অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে; তোমাদের পক্ষে যা সহজ আল্লাহ তাই চান ও তোমাদের পক্ষে যা কষ্টকর তা তিনি চান না এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা আল্লাহ বড়ত্ব বর্ণনা করো এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫)*

۞ ﴿اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾

☆ "রোযার রজনীতে আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে; তারা তোমাদের জন্যে আবরণ তোমরা তাদের জন্যে আবরণ, তোমরা যে আত্ম প্রতারণা করছিলে, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন, জন্যে তিনি এ তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের (অব্যাহতি দিয়েছেন); অতএব এক্ষণে তোমরা (রোযার রাত্রেও) তাদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান করো এবং সকালে কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান করো; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করো; তোমরা মসজিদে ইতেকাফ করবার সময় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলন করো না; এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না; এভাবে আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্যে তাঁর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তারা আল্লাহ ভীরু হয়।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭)*

হাদীসে রাসূল ﷺ

সিয়াম : দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

সরল অনুবাদ

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেন : "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, (২) সালাত ক্বায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রামাযানের সিয়াম পালন করা।"[১]

রাবী পরিচিতি

নাম 'আব্দুল্লাহ। উপনাম– আবূ 'আব্দুর রহমান। উপাধি রঈসুল মুহাদ্দেসীন। পিতার নাম– 'উমার ইবনুল খাত্তাব। মাতার নাম– যয়নব বিনতু মাযউন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত লাভের এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে পিতা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ১১ বছর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে নবুওয়াতের ১৩তম বছরে মদীনায় হিজরত করেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রথমবারের মতো খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাই'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রেরিত বিভিন্ন অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনায় অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০, ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লা-হ) ও ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লা-হ) যৌথভাবে ১৭০টি, এককভাবে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লা-হ) ৮১টি এবং ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লা-হ) ৩০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরি ৭৩ সালে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরের হত্যার তিন মাস পরে মতান্তরে ৬ মাস পরে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বা ৮৬ বছর। তাকে যী-তুয়া নামক স্থানে মুহাজিরদের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি সংক্রান্ত এটি একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। এর মধ্যে ইসলামী বিধিবিধানের মহাসম্মেলন ঘটেছে। একজন মুসলিমের জন্য তার রব সম্পর্কে, দ্বীন সম্পর্কে এবং নবী সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান রাখা আবশ্যক। অত্র হাদীস অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে। তাই এ হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে দ্বীনের পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। উপর্যুক্ত পাঁচটি স্তম্ভের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং দ্বীনের প্রথম চারটি স্তম্ভের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করে আসন্ন রামাযান উপলক্ষ্যে পাঠকের খিদমতে সওমে রমাযানের উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো।

০১. তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি : এটি ইসলামের প্রথম ও প্রধান রূকন। মহান আল্লাহর জন্য খালেসভাবে সকল 'ইবাদত করা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য মেনে নেওয়াই হলো তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি।

০২. সালাত ক্বায়েম করা : এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের অনন্য মাধ্যম। সালাত ক্বায়েম বলতে সালাতের ফর্‌য, সুন্নাতসহ প্রতিটি আহকাম সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী যথাযথ পালন করা এবং আল কুরআন ও

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

[১] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হা. ২২/১৬।*

সুন্নাহ'র নির্দেশনা অনুযায়ী তা নিয়মিত আদায় করা। এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। সালাত ব্যতিরেকে সকল নেক 'আমল গুরুত্বহীন।

০৩. যাকাত প্রদান করা : আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত চূড়ান্ত বিধানের আলোকে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা এবং সুষম বন্টননীতির নাম যাকাত। নিশ্চয়ই এটি ইসলামী অর্থনীতির মূল উৎস। শরিয়ায় নির্ধারিত সম্পদের সু-নির্দিষ্ট অংশ ০৮ (আট)টি খাতের মধ্যে বন্টন করাকে যাকাত বলে। এটা মনকে কৃপণতা থেকে এবং মাল-সম্পদকে অপবিত্রতা হতে পরিশুদ্ধ করে। এছাড়া ধনী ও গরিবের মধ্যে সমতা বিধানের একটি অন্যতম মাধ্যমও বটে।

০৪. হজ্জ করা : হজ্জের মাস আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। ঐ নির্ধারিত সময়ে ও শরিয়ত নির্ধারিত স্থানে তাওয়াফ, অবস্থান ও বিশেষ 'ইবাদতের মাধ্যমে যে কর্ম সম্পাদন করা হয়, তা-ই হজ্জ। এর মাধ্যমে বান্দাহ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। বিশ্ব মুসলিম সভ্যতার সাথে পরিচিত হয় এবং কা'বায় উপস্থিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়ার অঙ্গীকার করে। ফলে তা হজ্জকারী ও সাধারণ মুসলিম সমাজে কল্যাণকর প্রভাব ফেলে।

০৫. রমাযানের সিয়াম পালন করা : 'সাওম' বা 'সিয়াম'। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। আর ইসলামী পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদেক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও যাবতীয় সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম।

সিয়ামের ব্যাপকতা : সিয়াম সব যুগে সব নবী ও রাসূল এবং তাঁদের স্ব-স্ব ক্বাওম আদায় করেছেন। সিয়ামের সংখ্যা ও পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও এর প্রকৃত আহ্বান সর্বযুগে সমভাবে বহমান। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুওয়াত পাওয়ার আগেও সিয়াম পালন করেছেন। নবুওয়াত পাওয়ার পর সে ধারাবাহিকতা নিয়মিত অব্যাহত রেখেছিলেন।

কখন রামাযানের সিয়াম ফর্‌য হয়?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম হিজরিতে আশুরার সিয়ামকে আবশ্যক করে দেন। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরিতে রমাযানের সিয়াম ফর্‌য করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফর্‌য করা হলো যেমন ফর্‌য করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার।"[২] যে কেউ রামাযান মাস পেলে সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

অর্থ : "রামাযান মাস, যাতে মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নির্দেশনাসমৃদ্ধ। অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।"[৩]

সিয়াম ভাঙ্গার শর'ঈ ওযর কী?

০১. অসুস্থতা : কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে তা বিচার করতে হবে। যদি তার অসুস্থতা এমন হয় যে সে সুস্থতার আশা করে, তাহলে সিয়ম থেকে সাময়িক বিরত হবে এবং পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে এ সিয়াম ক্বাযা করবে। তার উপর কোনো কাফ্ফারা বর্তাবে না। আর যদি এমন অসুস্থ হয় যার সুস্থতার আশা নেই, তিনি প্রতিটি সিয়ামের বিনিময়ে অর্ধ 'সা' তথা সোয়া কেজি খাদ্যদ্রব্য ফিদইয়া হিসেবে গরিব-মিসকিনকে দিয়ে দেবেন। এতে তিনি ফর্‌য সিয়ম থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনে সিয়াম পালন করবে। আর যে সামর্থ্য রাখবে না, সে মিসকিনকে ফিদইয়া (খাদ্য) প্রদান করবে।"[৪]

---

[২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩।*
[৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*
[৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*

০২. মুসাফির ব্যক্তি : শরিয়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে মুসাফির বলে গণ্য হলে ইসলাম তার প্রতি সিয়ামের বিধান সহজ করে দিয়েছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সিয়াম পালন করবে। আর যদি কষ্টসাধ্য মনে হয়, তাহলে সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করবে না; বরং স্বাভাবিক খানাপিনা করবে এবং পরবর্তী সময়ে এ সিয়াম ক্বাযা করে নেবে। কোনো প্রকার কাফ্ফারা দিতে হবে না। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رضى الله عنها) أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ. أَفَأَصُوْمُ فِيْ السَّفَرِ قَالَ «صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ».

অর্থ : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, হামযাহ্ ইবনু 'আম্র আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিয়মিত সিয়াম পালন করি। আমি কি সফরে সিয়াম পালন করব? মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি চাইলে সিয়াম পালন করবে। আর চাইলে ইফতার করবে!" অর্থাৎ- সিয়াম পালন করবে না।[৫]

সিয়াম পালন না করার পরিণাম

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সিয়াম পালন না করা ফাসেকী কাজ। কোনো মুসলিম যদি ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে শরঈ ওযর ছাড়া সিয়াম ত্যাগ করতে পারে না। এটি এমন জঘন্য পাপ, যা সহজে মার্জনীয় নয়। একটি সিয়াম ছাড়লে সারা বছর নফল সিয়াম পালন করলেও ছুটে যাওয়া ঐ ফর্য সিয়ামের নেকীর সমান হবে না। প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْضِهِ عَنْهُ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ".

অর্থ : "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দেওয়া ওযর ছাড়া রামাযানের একটি সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে, সে সারা বছর (নফল) সিয়াম পালন করলেও তা ক্বাযা হবে না।" অর্থাৎ- ঐ ছুটে যাওয়া সিয়ামের সমপরিমাণ নেকী হবে না।[৬]

[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৪৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১০৪।*
[৬] *বায়হাক্বী- 'শু'আবুল ঈমান', হা. ৩৩৮২।*

সিয়ামের রহস্য

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। এটি যেমন গায়েবের বিষয়; ঠিক তেমনি সিয়াম এমন একটি 'ইবাদত, যা বান্দাহ ও তার রব মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত একান্ত বিষয়। এর মাধ্যমে বান্দাহর ইখলাস বা নিষ্ঠাবোধের প্রকাশ ঘটে। আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও সততার পরিচয় মেলে। সে কারণে এর প্রতিদান অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলা নিজে সায়েমকে পুরস্কৃত করবেন। জান্নাতের বিশেষ তোরণ 'রাইয়্যান' কেবল সিয়াম পালনকারীদের জন্য নির্ধারিত।

দারসের শিক্ষাসমূহ–

১. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের একমাত্র ইলাহী বিধান ইসলাম। যার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া মানবসভ্যতার মুক্তি অসম্ভব।

২. ঈমানের পর সর্বশ্রেণি পেশার মানুষের জন্য পালনীয় 'ইবাদত হচ্ছে সালাত ও সিয়াম। সালাত পরিত্যাগকারী কুফ্রীতে পতিত হবে। পক্ষান্তরে সিয়াম ত্যাগকারী ফাসেক্ব বলে বিবেচিত হবে।

৩. ইসলাম সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থার নাম। মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো 'ইবাদত চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

৪. রামাযানের সিয়াম সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন সব মুসলিমের উপর ফর্য। মুসাফির ও সাময়িক অসুস্থ ব্যক্তি রামাযানে তা না রাখতে পারলেও তা পরবর্তীতে আদায় করবে।

৫. বয়োবৃদ্ধ বা এমন রোগী– যারা সিয়াম পালন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তারা প্রতি দিনের সিয়ামের বদলে সোয়া কেজি মধ্যম মানের প্রধান খাদ্যদ্রব্য মিসকিনকে ফিদইয়া দিলে সিয়াম থেকে দায়মুক্ত হতে পারবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রকৃত ইসলাম বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। নিয়মিত 'আমলের মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দিন এবং আমাদেরকে ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাঁরা সিয়াম পালন করেছেন, তারাবীহ আদায় করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন ও ক্বদরের রাত পেয়ে ধন্য হয়েছেন –আমীন। ❑

প্রবন্ধ

নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[ষষ্ঠ পর্ব]

পৃথিবীর প্রাচীন অঞ্চলসমূহের অন্যতম দেশ ফিলিস্তিন। কৃষিনির্ভর ভূখণ্ডটিতে গড়ে উঠেছিল সভ্যতা। ব্রোঞ্জ যুগের প্রথম ও মধ্যভাগে স্বাধীন কেনানীয়[৭] নগর রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন মিসর, মেসোপটেমিয়, ফিনিসীয়, মাইনোয়ান, ক্রীট এবং সিরিয়ায় গড়ে উঠা সভ্যতা দ্বারা নগর-রাষ্ট্রগুলো প্রভাবান্বিত হয়েছিল। অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত এককালীন মরুদ্যান[৮] ফিলিস্তিন। সুপ্রাচীন এ ভূখণ্ডের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে– যুগে যুগে আসা মানবকুলের। পৃথিবীর বিদ্যমান তিনটি ধর্মের অনুসারী মুসলমান, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের পাতায় বিধৃত আছে ফিলিস্তিনের নানা ঘটনা। চড়াই-উৎরাই-এর ইতিহাস। বলাবাহুল্য, ইতিহাস সমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ জনপদগুলোর মধ্যে ফিলিস্তিন অন্যতম।

মর্মন্তুদ ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে সভ্যতার নির্মম পতনের ইতিহাস। পতনের অন্যতম কারণ হলো প্রতিহিংসা ও ধর্মীয় বিদ্বেষ। অথচ 'ধৃ' ধাতু থেকে নিচয়িত ধর্ম শব্দটি শান্তির প্রতীক। সকল ধর্মেই এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, 'মানুষের জন্য মানুষ'। বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হলো মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কবিকুল শিরোমনি দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'যার নিজ ধর্মের বিশ্বাস আছে, যে নিজ ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।' বিশ্বাস থেকে উৎসারিত আচরিত ধর্ম কারুর চক্ষুশূল হতে পারে না। অথচ সভ্যতা বিধ্বংসের ইতিহাসই হলো পরধর্মমতে অসহিষ্ণুতা।

ক্রুসেড[৯] (১০৯৫-১২৫৮) কিংবা বাগদাদ ধ্বংস[১০] (১২৫৮) প্রভৃতির পেছনে লুকিয়ে আছে ধর্মবিদ্বেষ। আর বিদ্বেষপ্রসূত জিঘাংসা। ফলশ্রুতিতে ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য সভ্যতা ও মানবতা। ছিন্ন হয়েছে সম্প্রীতির দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধন। বিলুপ্ত হয়েছে সখ্যতারও বন্ধন। কালের কপোলতলে হারিয়ে আবার গড়ে উঠেছে মানবতার বাজার যুগে যুগে। নূহ্[১১] (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরেরা খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সালের দিকে ফিলিস্তিনে প্রথম বসতি গড়ে তোলে। নূহের পুত্র কেনানের নামানুসারে ফিলিস্তিনের প্রাচীন নাম ছিল কেনান। তৎকালে ভূমধ্যসাগরের ওই অঞ্চলে বসবাসকারী বিচ্ছিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কেনানরা ছিল প্রধান। আবার এ ইতিহাসের সাথে মিশে আছে সেমিটিক জাতি থেকে আলাদা হয়ে হিব্রুদের নিজস্ব রাজ্য গড়ে তোলার

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৭] কেনানের বংশধরদের কেনানাইট বা কেনানীয় বলা হয়। কেনান হলো নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নাতি ও হামের পুত্র।

[৮] মরু অঞ্চলের বায়ুর অপসারণ কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ হলো মরুদ্যান।

[৯] মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। বিশেষ করে জেরুজালেম দখল কে কেন্দ্র করে মুসলিম-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক হলো 'ক্রুস' এ শব্দ থেকে ক্রুসেড শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

[১০] সমকালীন বিশ্বের এসখ্যাত মোঙ্গলীয় নেতা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হয়। রাজনৈতিক অরাজকতা ও মন্ত্রী মুঈদউদদীন আলকামীর প্ররোচনায় ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়। কথিত আছে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৬ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। ফলে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ইউফ্রেটিসের পানিও রক্তে লাল রূপ ধারণ করে। বাগদাদ ধ্বংসের ফলে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত মুসলিম সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটে। মুসলিম জ্ঞান ভাণ্ডার বাগদাদ নগরী মহাশ্মশানে পরিণত হয়।

[১১] আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পরে ইনি প্রথম নবী যাঁকে প্রথম রাসূলের পদ দান করা হয়েছে। সহীহ মুসলিম নবীদের শাফা'আতের অধ্যায়ে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃতি হয়েছে। তাতে বর্ণিত আছে–

يَا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ.

হে নূহ্! তোমাকে যমিনের উপর সর্বপ্রথম রাসূলরূপে বানান হয়েছে। **(সহীহ মুসলিম- হা. ৩২৭/১৯৪)**

পবিত্র কুরআন মাজীদের ২৮টি সূরার ৪৩ জায়গায় নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

কাহিনী। ইয়াহূদী ওই সব পূর্বপুরুষ যাদের তারা ইসরাঈল বলে পরিচয় দেয়। তারা মিসর থেকে ফিলিস্তিনে ফেরার পথে জুডা ও বেনিয়ামিন নামে দুই প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। ইয়াকুব[১২] (আলাইহিস সালাম)-এর এক পুত্র ছিলেন নবী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)[১৩] তাঁর পুত্র জুডা। কেনান তথা ফিলিস্তিনের যে অংশে জুডার অনুসারীদের বসবাস, সেই এলাকাকে জুডিয়া বলা হত।

ফিলিস্তিন নামকরণ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে কৌতুহল দেখা যায়। বস্তুত ফিলিস্তিন শব্দের উৎপত্তি হিব্রুভাষা 'পেলেসেতে' থেকে। যার অর্থ সাগরের কোলঘেঁষা লম্বা চওড়া এক ফালি কাপড়ের টুকরাসদৃশ ছোট উপত্যকা।[১৪] শব্দটির ভাবগত ব্যাখ্যা- রাজার প্রাসাদ। প্যালেস শব্দটি সম্প্রসারিত হয়ে পেলেসেত বা প্যালেস্টাইন হয়। আরবি ফিলিস্তিনের গ্রিক নাম প্যালেস্টাইন। ফিলিস্তিন নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকসূত্রে আরো একটি বিষয় অবগত হওয়া যায়। সূত্রে উল্লেখ আছে যে, আজাই নামধেয় এক ব্যক্তির ছেলের নাম প্যালাল। জেরুজালেমের দেয়াল মেরামতের কাজে প্যালাল অর্থ ও জনবল দিয়ে নেহেমিয়া নামে জুডা গোষ্ঠীর এক নেতাকে সহায়তা দেন।

বিশ্বব্যাপী ইয়াহূদীদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সর্বজনবিদিত। আমেরিকার মতো বিশাল ও শক্তিধর দেশও ইয়াহূদীদের হাতের মুঠোয়। জ্ঞানচর্চা ও সম্পদে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ইয়াহূদীদের দৌরাত্ম্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে ইয়াহূদীরা প্যালেস্টাইন নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ক্ষমতাধর এ জাতিটির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করা দরকার। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ[১৫] সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, নবী ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধারায় ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও ইসলামের আবির্ভাব। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক (আলাইহিস সালাম)। নবী ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)। ইনিই ইসরাঈল নামে পরিচিত ছিলেন। ইসরাঈল ইবরানী ভাষার শব্দ বিশেষ। 'ইস্‌রা শব্দের অর্থ عبد (দাস) এবং ايل অর্থ (আল্লাহ) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে একটি যুক্ত নাম। ইসরাঈল শব্দের আরবি অর্থ 'আব্দুল্লাহ। ইবরানী নামানুসারে এদের বংশধর বানী ইসরাঈল নামে অভিহিত। ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর ১২ জন সন্তান। তন্মধ্যে ইসাচার (ইয়াহূদা) ও জোসেফ (ইউসুফ আলাইহিস সালাম) অন্যতম। ১২ জন পুত্রের ১২টি গোত্র ও এরা সবাই বানী ইসরাঈল নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে ইয়াহূদের নামানুসারে ইয়াহূদী নামের উদ্ভব। বানী ইসরাঈলের সবাই এখন ইয়াহূদী নামে পরিচিত। তবে বর্তমান দুনিয়ায় যারা ইয়াহূদী তাদের সবারই এক ধরনের নয় বলে অনেক নৃতাত্ত্বিক মত প্রকাশ করেছেন। কেননা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে

[১২] ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তিনি কেনানবাসীর (ফিলিস্তিন) হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বহু বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার এই খিদমতের কর্তব্য পালন করেছেন। কুরআন মাজীদের ৭টি সূরাতে অন্তত ১০ জায়গায় নবী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। তিনি ইসহাক (আলাইহিস সালাম) নবী'র পুত্র ও ইব্রাহীম নবীর পৌত্র ছিলেন।

[১৩] ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইসহাকের পুত্র ও নবী ইব্রাহীমের পৌত্র। সৌম দর্শন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ললাটে দীপ্তিমান নূরের চিহ্ন ছিল। কুরআন মাজীদের তিনটি সূরায় ২৪ বার নবী ইউসুফের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে।

[১৪] উপত্যকা দু'টি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত সমতল বা অসমতল, ঢালু, প্রশস্ত ভূমিক্ষেত্র। পর্বতের শীর্ষ থেকে বরফ গলা পানি বা বৃষ্টির পানির স্রোত যখন পর্বতের খাড়া ঢাল বেয়ে দ্রুত বেগে নেমে আসে, তখন পাহাড়ের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে হাজার বছরের পরিক্রমার উপত্যকার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় হিমবাহ অর্থাৎ- বরফের নদী পর্বতের শীর্ষ থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামার সময় উঁচু নীচু শিলা পাথরগুলোকে সরিয়ে চূর্ণ করে সমতল মাটির স্তর তৈরি করে, উপত্যকার জন্ম হয়। আবার কখনো কখনো নদী গতি বদলালে এর পুরাতন অববাহিকাটিতে উপত্যকার সৃষ্টি হয়। নদীর পরিত্যক্ত গতিপথে যে বেলাভূমির সৃষ্টি হয় তা-ই উপত্যকা। পরিক্রমায় প্যালাল শক্তিশালী হয়ে উঠেন। অনেকের ধারনা প্যালালের নামানুসারে ফিলিস্তিন শব্দের উৎপত্তি।

[১৫] ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে সে সকল বিশেষ গ্রন্থ যাতে মানুষের জীবন যাপনের বিধান, ভালো কাজ করার পরামর্শ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। পৃথিবীতে যুগে যুগে প্রচারিত সকল ধর্মেরই ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বিশেষত আলোচ্যসূত্রে মুসলমানদের কুরআন, খ্রিষ্টানদের বাইবেল ও ইয়াহূদীদের তানাখ ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে কুরআন মাজীদ অন্যতম। মোটা দাগে এখানে তাওহীদ, আরকান ও নসিহত সন্নিবেশিত আছে যা অন্য ধর্মগ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হয় না।

ছিটিয়ে থাকা ইয়াহূদীদের চেহারা ও শারীরিক গঠনে সাদৃশ্য নেই।

ইয়াহূদী ও মুসলমানদের বিরোধের সূচনা নবী হিসেবে মহানবীর আগমন ও ওয়াহীযোগে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই এবং এটি ছিল ইয়াহূদীদের কৌলিন্যবোধ। তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা মতে মহানবী হলেন ইব্রাহীমের বাঁদি স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমা'ঈল বংশসম্ভূত। আর ইয়াহূদীরা হলেন ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর প্রথম স্ত্রী শাহজাদী সারা'র সন্তান ইসহাক বংশসম্ভূত। ইয়াহূদীরা মনে করে, তারা সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণির অর্থাৎ- বাঁদি সম্ভূত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহূদী-মুসলমান দ্বন্দ্ব যেন আশরাফ-আতরাফ-আজলাফ বিরোধ। অথচ মানবতায় চূড়ান্ত মর্ম বাণী, সব মানুষ আদমের সন্তান। মানুষে মানুষে নেই কোনো ভেদাভেদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ﴾

"তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। তারপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছ?"[১৬] ইয়াহূদীরা বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড দৃষ্টে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"বলো : হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোনো মানুষ নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[১৭]

বাস্তবতা হলো কৌলিন্য ভাবধারায় সংক্রমিত ইয়াহূদীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চায়। অথচ মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। এদিক বিবেচনায় নিলে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় ইয়াহূদীরা চূড়ান্ত বর্ণবাদী একটি জাতিগোষ্ঠী। বিশিষ্ট আরব বুদ্ধিজীবী মোহাম্মদ রাবি অভিমত দেন যে, "এই দ্বন্দ্ব ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় অভিজ্ঞতার গভীরে প্রোথিত দু'টি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর নৈতিক ও ঐতিহাসিক দাবির সংঘাত।"

ফিলিস্তিনের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বড়ই স্ট্রাটেজিক। ভূ-ভাগটি মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। ফিলিস্তিনের পূর্বে রয়েছে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান ও সৌদি আরব। পশ্চিমে আফ্রিকান মিসর। পূর্ব অঞ্চল কিন্তু তেল সমৃদ্ধ। ফিলিস্তিনের পশ্চিমে ভূ-মধ্য সাগর। যার তীরে সাইপ্রাস, তুরস্ক, মিসর, গ্রিসসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো অবস্থিত। ইউরোপ থেকে সড়ক পথে আফ্রিকা যাবার উপায় একমাত্র পথ ফিলিস্তিনের বুক চিরে। ফিলিস্তিন এশিয়া ও আফ্রিকার দরজা। এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা মহাদেশের মাঝে দেশটি অবস্থিত। ফিলিস্তিনের দক্ষিণাংশে গালফ অব আকাবা বা আকাবা উপসাগর। আকাবা সাগরের কোল ঘেষে কিংডম অব সাউদি আরাবিয়া।

ফিলিস্তিনের অবস্থানিক গুরুত্ব এখানেই শেষ নয় ফিলিস্তিনের একপাশে সুয়েজখাল পর্যন্ত বিস্তৃত সিনাই উপত্যকা। আকাবা উপসাগরের সামনে রয়েছে লোহিত সাগর। মিসর ও ফিলিস্তিন ব্যতীত অন্যকোনো দেশ ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী নয়। ইউরোপ ও এশিয়ার জাহাজগুলোর চলাচল সুয়েজখাল অবলম্বন করে। ফিলিস্তিন থেকে যার দূরত্ব মাত্র ২০০ কি.মি.। সে কারণে সুয়েজখালের প্রতি নজর রাখা সাইপ্রাস থেকেও সুবিধাজনক। কৌশলগত কারণে কখনও সুয়েজখালের বিকল্প চিন্তা করলেই ফিলিস্তিনের প্রয়োজন পড়বে। আরো কতিপয় কারণে ফিলিস্তিনের

[১৬] সূরা আয্ যুমার : ৬।

[১৭] সূরা আল জুমু'আহ্ : ৬। আরো দেখুন : সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৮০, ১১১; আ-লি 'ইমরান : ২৪ ও আল মায়িদাহ্ : ১৮।

অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে রয়েছে নজব এলাকা। ফিলিস্তিনের মধ্যস্থানে অবস্থিত বহুলালোচিত পশ্চিম তীর। পশ্চিম তীরের পুরা এলাকা জর্দান পর্বতমালার উঁচু-নীচু পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। জর্দান নদী ফিলিস্তিনের পূর্বদিকে অবস্থিত। জর্দান নদী গোলান পর্বতমালা হতে শুরু হয়ে সি অব গ্যালিলি হয়ে মৃত সাগরে (Dead Sea) মিলিত হয়। সি অব গ্যালিলির পাশে অবস্থিত আপার জর্দান ভ্যালী ও জারজিল ভ্যালি চাষাবাদের জন্য বড়ো উপযোগী। সি অব গ্যালিলি সুপেয় পানির বৃহৎ উৎস। পশ্চিমতীরের সাথে ফিলিস্তিনের উপকূলীয় এলাকা শ্যারন প্লেন অবস্থিত। পশ্চিম তীরে রয়েছে ইতিহাসের নমস্যভূমি জেরুজালেম।

মরুশহর হিসেবে ফিলিস্তিন তথা জেরুজালেমের পরিচিতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই। ইউনেস্কোর তথ্যাবলম্বনে প্রতীতি হয় যে, এখানে লুকিয়ে আছে হাজারো ইতিহাস, ঐতিহ্য, বীরত্ব ও উত্থান-পতনের কাহিনী। লুকিয়ে আছে ধর্মীয় আবেদনে ভরপুর প্রাচীন জনপদের হাজার বছরের গল্প গাঁথা। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কা'বাঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর তার পুত্র ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তান ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এখানেই মসজিদে আকসা নির্মাণ করেছিলেন। পবিত্র কাবা প্রথম কিবলা হলেও মসজিদুল আকসা পরবর্তীতে কিবলার সম্মান পায়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে পরিবর্তিত হয়ে, কিবলা কাবাঘরের দিকে চলে আসে। খলিফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪) বায়তুল মোকাদ্দাস ও জেরুজালেম খিলাফতের অধীনে আসে। ১০৯৬ সালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা একটা রক্তক্ষয়ী আক্রমণের মাধ্যমে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন জবরদখল করে। ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবী জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। পরবর্তীতে 'উসমানীয় সাম্রজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভূখণ্ডটি ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ১৯১৭ সালে বৃটিশ উপনিবেশিক ইংরেজ খ্রিষ্টানরা ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করে। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত কিংবা স্বেচ্ছায় মাইগ্রেশন নিয়ে ইয়াহূদীরা ফিলিস্তিনে এসে বসতি শুরু করে। আন্তর্জাতিকভাবে ইয়াহূদীদের আহ্বানের ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিনে ইয়াহূদী বসতির ধারা অব্যাহত থাকে। অচিরেই মুসলমানদের অপসারণ করে সংখ্যায় গরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফিলিস্তিন ক্রমশ মুসলমানদের হাতছাড়া হতে শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইঙ্গ মার্কিন ষড়যন্ত্রে ইসরাঈল নামক ইয়াহূদী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৮ সালে ১৫ জুলাই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে জোরপূর্বক ইসরাঈল রাষ্ট্রের শুরু। অবৈধভাবে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আরবরা (মিসর, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান ও ইরাক) প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জায়নবাদী ইউরোপ ও রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারেনি। ১৯৪৯ সালের প্রথম ভাগে আরবদের সাথে ইসরাঈলের সামরিক যুদ্ধবিরতি হয়। সামরিক যুদ্ধবিরতি হলেও মুসলমানদের উচ্ছেদ কার্যক্রম চলতে থাকে। ইয়াহূদী বসতি স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চল গ্রাস করার নীল নক্শা বাস্তবায়নের ধারা অনুসৃত হতে থাকে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পরপরই ফিলিস্তিনের লাখ লাখ মুসলিম জনতার উপর নেমে আসে অনিঃশেষ বিপর্যয়। ইয়াহূদী সশস্ত্র গোষ্ঠীর উপর্যুপরি জ্বালাতনে ফিলিস্তিনবাসীর নাভিশ্বাস উঠে যায়। টিকে থাকার ন্যূনতম অধিকার যেন তারা হারিয়ে ফেলে। প্রাণভয়ে লাখ লাখ ফিলিস্তিনী বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ ছেড়ে আত্মরক্ষার্থে পালাতে থাকে। দলে দলে জর্দান, লেবানন ও সিরিয়ায় গিয়ে উদ্‌বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন :

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"
(শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃঃ, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

হারাম উপার্জনে হালালের পরিণতি

–মুহাম্মদ গোলাম রহমান

ইসলামী শরিয়তে হালাল-হারামের বিধান সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত। রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের সম্মুখে হালাল-হারামের বিবরণ স্বচ্ছ-সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। একজন সাধারণ মুসলিমও জানেন যে, গরু-ছাগল, হাস-মুরগির মাংস যেমন হালাল; অনুরূপ শুকর-কুকুর, বিড়াল-শৃগাল প্রভৃতি হিংস্র পশু-পাখির মাংস হারাম। একজন সাধারণ মুসলিম এটাও জানেন যে, মদ্যপান, রক্তপান এবং সকল অপবিত্র বস্তু সর্বাবস্থায় হারাম ও বর্জনীয়। অর্থাৎ- যে সকল খাদ্যবস্তু শরিয়তে নিষিদ্ধ, তা তো সর্বাবস্থায়ই হারাম এবং মুসলিমগণ সাধারণত তা বর্জন করেই চলেন। কিন্তু যে সকল খাদ্যবস্তু আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হালাল করেছেন, সে সকল খাদ্যবস্তুও কখনো কখনো হারাম বলে গণ্য হয়, কেবল উপার্জন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত ত্রুটি থাকার কারণে।

যা কিছু হারাম বলে সুনির্দিষ্ট তা যেমন সর্বাবস্থায় বর্জনীয়, অনুরূপ প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে যে হালাল বস্তু হারামে রূপান্তরিত হয়, তাও পরিপূর্ণরূপে বর্জনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ﴾

"হে মানব সম্প্রদায়! পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১৮]

উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় এটাই বুঝানো হয়েছে যে, খাদ্য হালাল হওয়ার পাশাপাশি পবিত্রও হতে হবে। উপার্জন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত ত্রুটি থাকলে হালাল খাদ্যও অপবিত্র ও হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পুনশ্চ ইরশাদ করেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ সেসব খাদ্যবস্তু হালাল করেছেন সে গুলোকে হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[১৯]

এ আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যা কিছু হারাম, তা তো সর্বাবস্থায় এবং সকল ক্ষেত্রে হারাম। কিন্তুআল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহে যা কিছু হালাল করেছেন, পদ্ধতিগত ত্রুটির মাধ্যমে তা হারাম করে নেয়া চূড়ান্ত সীমালঙ্ঘনের নামান্তর।

হালাল গ্রহণ জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত : একজন মুমিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন সাঙ্গ করে তাকে অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমাতে হবে। সেই অনন্ত জীবনকে সুখময় করতে আল্লাহ তা'আলা শর্ত আরোপ করেছেন যে, বান্দাকে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য 'ইবাদত ও হালাল ভক্ষণের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেন,

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ؟

"যে ব্যক্তির খাদ্যবস্তু হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং দেহ হারাম খাদ্যদ্বারা গঠিত তার দু'আ কীভাবে কবূল হবে?"[২০] অর্থাৎ- যার আপদমস্তক হারাম দ্বারা বেষ্টিত সে কীভাবে জান্নাতের প্রত্যাশা করে? নবী মুহাম্মাদ ﷺ পুনশ্চ সতর্ক করে বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ.

"এমন দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে দেহ হারাম খাদ্যদ্বারা গঠিত।"[২১] অর্থাৎ- হারাম গ্রহণ বা ভক্ষণ করে, দিবা-নিশী মহান আল্লাহর 'ইবাদতে মশগুল থাকলেও সে 'ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হবে না; বরং তার সমস্ত শ্রম পণ্ড হবে।

হালাল খাদ্য যেভাবে হারাম হয় :

১. গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা : গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা হালাল পশু (গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি) মুসলিমের জন্যে হারাম। অর্থাৎ- যবেহ করার সময় যে পশুর উপর আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয় না তা ভক্ষণ করা হারাম। এছাড়াও পীরের দরগাহে বা মাজারে উৎসর্গকৃত পশু অথবা দেব-দেবীর নামে যবেহকৃত বা উৎসর্গিত পশুর মাংস ভক্ষণ করাও হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ...﴾

---

[১৮]. *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৬৮।*

[১৯]. *সূরা আল মায়িদাহ : ৮৭।*

[২০]. *সহীহ মুসলিম- হা. ১০১৫।*

[২১]. *জামে' আত্ তিরিমিযী- হা. ২৬০৯।*

"তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন, যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।"[২২]

অর্থাৎ- গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদির মাংস হালাল হওয়া সত্ত্বেও তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত না হওয়ায়, প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে তা হারাম বলে গণ্য হবে।

২. সুদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ : মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, সাধারণত অর্থের বিনিময়ে মানুষ তা সংগ্রহ করে থাকে। যদি উপার্জিত অর্থ হালাল হয়, তবে তা দিয়ে ক্রয়কৃত খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি হালাল বা বৈধ হবে। কিন্তু উপার্জন প্রক্রিয়ায় সুদের অনুপ্রবেশ ঘটলে ঐ অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত খাদ্য-বস্ত্র যাবতীয় কিছু হারাম বলে গণ্য হবে।

স্মর্তব্য যে, সুদদাতা, গ্রহীতা, সাক্ষী, হিসাবরক্ষক সকলেই সমভাবে অপরাধী। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ শ্রেণিসকলকে লানত (অভিসম্পাত) করেছেন।[২৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيْنَ ○ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড়ো তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"[২৪]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও সুদ পরস্পর বিরোধী। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ﴾

"যারা সুদ খায়, তারা (হাশরের মাঠে) এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেন শয়তানের স্পর্শে পাগল।"[২৫]

সুদখোরদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ، فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا».

আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উর্ধ্বাকাশে (মি'রাজ) ভ্রমণকালে সেখানে আমি এমন সব লোকের কাছে আসলাম, যাদের পেট সামনের দিকে বর্ধিত গৃহসদৃশ ছিল এবং তা সাপ-বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ ছিল; যা পেটের বাইরে থেকেও দৃশ্যমান ছিল। আমি বললাম, (হে জীবরীল!) এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর।[২৬]

অর্থাৎ- শরিয়ত নির্ধারিত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উপার্জিত অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত যে সব খাদ্য হালাল, সুদের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত ঐ সকল খাদ্যই হারাম হিসেবে গণ্য হবে।

৩. ঘুষের মাধ্যমে লব্ধ অর্থ : জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক হক বা অধিকার স্বাভাবিক নিয়মে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার যে কৌশল, এ প্রক্রিয়াকে ঘুষ বলে। আর এ প্রক্রিয়ায় উপার্জিত অর্থ বিলকুল হারাম। সুতরাং ঘুষলব্ধ অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত হালাল খাদ্য-বস্ত্র সবই হারাম বলে বিবেচিত। ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে লানতপ্রাপ্ত। এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যে বিশেষ সতর্কবার্তা।

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ».

অর্থাৎ- ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী (উভয়কে) আল্লাহ তা'আলা লানত (অভিসম্পাত) করেছেন।[২৭]

অন্যত্র 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র رضي الله عنه হতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوْ، قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী (উভয়কে) লানত (অভিসম্পাত) করেছেন।[২৮]

যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং ইমামুল মুরসালিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক লানত তথা অভিসম্পাতপ্রাপ্ত তার মতো ঘৃণ্য নরপিশাচ আর কে হতে পারে?

৪. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ : ইয়াতীমের মনে একদিকে পিতা-মাতা হারানোর বেদনা অন্যদিকে অভিভাবকহীন অসহায় জীবন। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াতীমের প্রতি দয়াপরবশ হতে বলেছেন। কিন্তু সমাজের

[২২]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৭৩।*
[২৩]. *মুসলিম- হা. ১৫৯৭; আবূ দাউদ- হা. ৩৩৩৩; তিরমিযী- হা. ১২০৬।*
[২৪]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৮-২৭৯।*
[২৫]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৫।*
[২৬]. *মুসনাদ আহমদ- হা. ৮৬৪০; ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৭৩।*
[২৭]. *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৩১৩।*
[২৮]. *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৫৮০; আত্ তিরমিযী- হা. ১৩৩৬।*

একশ্রেণির সম্পদলোভী মানুষ স্বীয় নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করতে দ্বিধা করে না। এদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সতর্কবার্তা :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا﴾

"যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদর আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে; অচিরেই তারা অগ্নিগর্ভ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[২৯]

কেবল ইয়াতীমের সম্পদ নয়; বরং জবরদখলকৃত, অন্যায়ভাবে ছলে-বলে কৌশলে কিংবা ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত যে কোনো সম্পদ মুসলিমের জন্যে অপবিত্র-হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করো না এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।"[৩০]

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং তা বিচারকের নিকট এ জন্যে পেশ করো না, যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে অন্যের সম্পদের অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে পারো।"[৩১]

উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে একশ্রেণির লোভাতুর নরপিশাচ অন্যের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করার মানসে বিভিন্ন রকম ঘৃণ্য ছল-চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে। আর অন্যের হক্ব বা অধিকার অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম। অতএব, এ হারাম অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত হালাল বস্তুও হারাম বলে গন্য হবে।

৫. জুয়ার মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ : মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের উপর আস্থা হারিয়ে স্বীয় ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নেয়, তখন সে নিজ ভাগ্যের উন্নতিকল্পে মরিচিকার পিছনে ছোটে। আর ভাগ্য পরিবর্তনের মিছেমিছি এক প্রচেষ্টার নাম জুয়া। আর নিজের ভাগ্য নিজ হাতে তুলে নেয়ার অর্থ ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ তাকদীরকে অস্বীকার করা, যা কুফ্‌রী। জুয়া শুধু পাপের জন্ম দেয় তা নয়; বরং জুয়াড়ী এক পর্যায়ে সম্পদ-সর্বস্ব বিনষ্ট করে নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে যায়। অবশেষে তার ভাগ্যে নেমে আসে অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা আর অপমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ﴾

"মদ ও জুয়া সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে; (হে নবী!) তুমি বলো, এ দু'টোর মধ্যেই গুরুতর পাপ রয়েছে।"[৩২]

আর গুরুতর পাপের মাধ্যমে লব্ধ অর্থ কখনোই হালাল হতে পারে না; বরং সন্দেহাতীতভাবে তা হারাম ও বর্জনীয়।

৬. পরিমাপে কম দেয়া : পরিমাপে কম দেয়া একপ্রকার প্রতারণা। আর এ জাতীয় প্রতারকের ইহ-পরকালীন পরিণাম কখনোই শুভ নয়। কেননা ভোক্তা যখন জানবে যে, সে বিক্রেতার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে, তখন ভোক্তা তার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে এবং একপর্যায়ে বিক্রেতা ক্রেতাশূন্য হয়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর ঐ ব্যক্তির পরজীবনও নিকৃষ্টতর। আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

"মেপে দেয়ার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[৩৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ﴾

"মন্দ পরিণাম তাদের জন্যে যারা পরিমাপে কম দেয়।"[৩৪]

অতএব পরিমাপে ফাঁকি দিয়ে বাড়তি উপার্জনের ঘৃণ্য পন্থা কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না; বরং তা হারাম ও অবৈধ।

৭. পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বিক্রি করা : পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বিক্রি করার অর্থ হলো, ভোক্তা বা

[২৯]. *সূরা আন্ নিসা : ১০।*
[৩০]. *সূরা আন্ নিসা : ২৯।*
[৩১]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৮।*
[৩২]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১৯।*
[৩৩]. *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৩৫।*
[৩৪]. *সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন : ১।*

ক্রেতাসাধারণের সাথে প্রতারণা করা। আর বিক্রয়ে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ মুসলিমের জন্যে বৈধ নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সতর্কবাণী :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা কোনো এক খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি তাঁর হাত ঐ খাদ্যের মাঝে প্রবেশ করালেন এবং তার হাত ভেজা পেলেন। তখন তিনি (ﷺ) বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তখন খাদ্য বিক্রেতা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! বৃষ্টিতে তা ভিজে গেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, কেন তুমি সে খাদ্যগুলোকে উপরে রাখলে না? যাতে ক্রেতা পণ্যের ত্রুটি দেখে নিতে পারে। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।[৩৫]

৮. গণক-জ্যোতিষী, যাদুবিদ্যা এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন : গণক-জ্যোতিষী, যাদুবিদ্যা এবং ব্যভিচার ইত্যাদি কবীরা গুনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজ। খালেস তাওবাহ্ এবং হদ কায়িম ব্যতীত এ ভয়াবহ পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। যে কার্যের ফলে গুনাহ-কবীরা বা ঈমানবিধ্বংসী পাপ সংঘটিত হয়- সে সকল কার্যদ্বারা উপার্জন কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেছেন :

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ.

আবূ মাস্'উদ আল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পরিতোষক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৩৬]

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা উপক্ষা করে এ জাতীয় উপার্জন সন্দেহাতীত হারাম ও অবৈধ।

(ঝ) ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা শপথ করা : ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া মাকরূহ- যদিও তা সত্য হয়। আর পণ্যের মিথ্যা গুণাগুণ বর্ণনা করে কসম করা জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী :

«الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».

'কসম' পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে; কিন্তু লাভ (বরকত) বিনষ্ট করে।[৩৭] আর যারা স্বীয় অঙ্গীকার ও শপথ স্বল্পমূল্যে বিকিকিনি করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনোই অংশ নেই এবং আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না ও কিয়ামত দিবসে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৩৮]

অর্থাৎ- যে সকল কাজের সাথে মিথ্যা, ছলনা, প্রতারণা ও পাপের ন্যূনতম সম্পর্ক আছে, তা পরিত্যাজ্য ও অবৈধ এবং একটি পর্যায়ে তা মু'মিনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঈমানকেও ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেছেন :

«اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ المُوْبِقَاتِ»، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ».

ঈমান ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে সাতটি বিষয় কী? তিনি (ﷺ) বললেন, ১. মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. যাদু করা, ৩. যথার্থ কারণ ছাড়া যাকে হত্যা করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা, ৬. যুদ্ধ চলাকালে জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং ৭. সতি-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া, যা সে কখনো কল্পনাও করে না।[৩৯]

উল্লেখ্য যে, একজন ব্যবসায়ীর মূলধন হালাল, ব্যবসায়িক সম্পদও হালাল, বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশও হালাল কিন্তু অহেতুক

---

[৩৫]. *সহীহ মুসলিম- হা. ১০২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৪৫২।*
[৩৬]. *বুখারী- হা. ২২৩৭ ও ২২৮২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৬৭।*
[৩৭]. *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬০৬; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৩৩৫।*
[৩৮]. *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৭৭।*
[৩৯]. *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৬৬।*

কিছু কথা, কাজ বা ত্রুটিগত পদ্ধতির কারণে তা হারাম হিসেবে গণ্য হচ্ছে। সুতরাং জীবন চলার পথে সততার পাশাপাছি সতর্কতাও অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়, যা আমাদের ইহ-পর জীবনকে সানন্দ সমৃদ্ধ করবে ইন্শা-আল্লাহ।

চুরি ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্জিত : চুরি ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্জিত হালাল বস্তুও হারাম বলে গন্য হবে।

বাঁচার উপায় : আমরা কোনো কথা বলা কিংবা কাজ শুরু করার আগে একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করি- আমি যা বলছি বা করছি- তা-কি ঠিক করছি বা বলছি? মন যদি বলে হ্যাঁ, তবে তাতে পাপের সম্ভাবনা নেই। আর যদি বলে, না- তবে তা পাপকার্জ। এ জন্যে প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা আত্মজিজ্ঞাসা করি- তাহলে অপবিত্রতা আমাদেরকে স্পর্শ করতে পরবে না- ইন্শা-আল্লাহ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাও তা-ই।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

নাওওয়াস ইবনু সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পুণ্যবত্তা হলো সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হলো তা-ই; যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং মানুষ তা জেনে ফেলুক- এ কথা তুমি অপছন্দ করো।[৪০] অন্য বর্ণনায় আছে–

عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

আবূ হাওরা আস সা'দী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম, আপনি রাসূল থেকে কি স্মরণ রেখেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (এ হাদীস) স্মরণ রেখেছি- (তিনি [ﷺ] বলেছিলেন) তা-ই বর্জন করো, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা-ই গ্রহণ করো, যাতে তোমার সন্দেহ নেই।[৪১]

অতএব, সাবধান হওয়া অত্যন্ত জরুরি, কেননা হালাল ও হারামের উপর নির্ভর করছে চিরস্থায়ী নিবাস জান্নাত ও জাহান্নাম। সুতরাং সামান্য লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়া অর্বচীনদের কাজ বৈ আর কি হতে পারে? ❑

[৪০]. *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৮৯; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৭১৭৯।*

[৪১]. *আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১৮; আন্ নাসায়ী- হা. ৫৭১১।*

তিন বন্ধুর গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ

[৩০ পৃষ্ঠার পর]

পরদিন সকালবেলা। আখনাস ইবন শুরায়ক ছুটলো আবূ সুফিয়ানের বাড়ি। এই তিনদিন রাসূলের (ﷺ) কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে তার 'রিভিউ' জানতে। আবূ সুফিয়ান বললো, "হে আবূ সা'লাবা! আল্লাহর কসম! তিলাওয়াতের কিছু কথা এমন ছিল যা আমি বুঝলাম, কিছু কথা এমন ছিল যা আমি বুঝিনি।"

আখনাসেরও একই মন্তব্য।

আখনাস এবার ছুটলো আবূ জাহেলের বাড়ি। আবূ জাহেল বললো, "কী আর বলবো! আমরা [মুহাম্মাদ (ﷺ) কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রের এবং ইবনু হিশাম কুরাইশের বানু মাখজম গোত্রের।] কুরাইশ বংশের দু'টো শাখাগোত্র। দীর্ঘকাল ধরে আমরা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা করে আসছি। আপ্যায়ন ও ভোজের আয়োজন তাঁরাও করছে, আমরাও করছি। সবকিছুতে তাঁরাও বদান্যতা দেখিয়েছে, আমরাও দেখিয়েছি। এভাবে তারা এবং আমরা তাল মিলিয়ে চলেছি। এবার তারা দাবি করলো, তাদের মধ্যে একজন নবী এসেছেন, যার কাছে আসমানী কিতাব নাযিল হয়। এ পর্যায়ে আমরা কিভাবে তাদের সমকক্ষ হবো, আমরা কিভাবে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করবো? আল্লাহর কসম! আমরা তাঁর উপর ঈমান আনবো না এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেবো না।"[৪২]

নবীজী (ﷺ)-এর সুমধুর তিলাওয়াত শুনতে যে না ঘুমিয়ে, মধ্যরাতে আরামের বিছানা ছেড়ে নবীজী (ﷺ)-এর বাড়িতে যেতো, সে শুধুমাত্র জাতাভিমানের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেনি। গোত্রের মর্যাদা তার কাছে সত্যের চেয়েও মহত্ত্ব ছিল।

মধ্যরাতে কুরআন শুনতে যাওয়া তিনজনের মধ্যে শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

তথ্যসূত্র :

- *ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)- পৃ. ১৯৩।*
- *ইবনুল আসির উসুদুল গাবা- তেহরান, ১২৮৬ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।*
- *আল-ইসাবা- ইবনু হাজার, মিসর, ১৩২৮ হি., ১ম খণ্ড, ২৫-২৬ পৃ., নং- ৬১।*

[৪২] *সীরাত ইবনু হিশাম- ১/২৭৮-২৭৯।*

তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মূল : সউদ বিন আব্দুল মুহ্সিন আস সায়েদী*
অনুবাদ : আহমাদ রফিক*

ভূমিকা : কুরআনুল কারীমের তাফসীর বা ব্যাখ্যা রাসূল (ﷺ)-এর যুগ থেকেই মূলত শুরু হয়। যখনই সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর নিকট কুরআনের কোনো আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট মনে হতো, তখনই তারা প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করতেন। রাসূল (ﷺ) তাদের অস্পষ্টতা দূর করে দিতেন এবং তাদেরকে আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন– 'জেনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূল (ﷺ) যেভাবে সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে কুরআনের তিলাওয়াত শিখিয়েছেন, সেভাবে তাদেরকে কুরআনের তাফসীরও শিখিয়েছেন। কারণ আল্লাহর বাণী ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ "মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে"[৪৩] দ্বারা উভয় প্রকার শিক্ষাই উদ্দেশ্য।'[৪৪] ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং জুলুম দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি।"[৪৫]

আয়াতটি অবতীর্ণ হলে তা নেওয়া সাহাবায়ে কিরামের জন্য কঠিন হয়ে পড়লো। তারা বলতে লাগলো– আমাদের মধ্যে তো এমন কেউ-ই নেই যে নিজের উপর জুলুম করে না! রাসূল (ﷺ) বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দিলেন। তিনি বললেন– "তোমরা যা ভাবছো ব্যাপারটি আসলে সে রকম নয়। এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ নিজপুত্রকে লক্ষ্য করে বলা লোকমান (আলাইহিস সালাম)-এর কথার মতো–

﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কোনোকিছু শরীক করো না। নিশ্চয় শির্ক বিরাট জুলুম।"[৪৬]

অর্থাৎ- এখানে জুলুম দ্বারা শির্ক উদ্দেশ্য।"[৪৭]

সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সরাসরি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে কুরআনের তাফসীর শিখে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। যেমনটি বর্ণনা করেছেন আবূ 'আব্দুর রহমান আস সুলামী। তিনি বলেন– 'উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং আরো যারা আমাদেরকে কুরআন শিখিয়েছেন তারা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তারা রাসূল (ﷺ)-এর কাছে দশটি আয়াত শেখার পর ঐ দশ আয়াতের পরিপূর্ণ অর্থ বুঝার আগ পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতে যেতেন না। তারা বলেন– "আমরা কুরআনের তিলাওয়াত, কুরআনের অর্থ ও কুরআনের 'আমল একসঙ্গে শিখেছি।"[৪৮] আর এ কারণেই একেকটি সূরা মুখস্থ করতে তাদের অনেক সময় লাগতো।'[৪৯]

রাসূল (ﷺ)-এর যুগে তাফসীরশাস্ত্র নামে স্বতন্ত্র কোনো শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করতেন, সেভাবেই তাফসীর বর্ণনা করতেন। এই রীতি সাহাবায়ে কিরামের যুগে প্রচলিত ছিল। এরপর শুরু হলো তাবেয়ীদের যুগ। যারা সরাসরি সাহাবাদের কাছ থেকে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাবেয়ীগণ রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীস, কুরআনের আয়াতের তাফসীর এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ একত্রিত করেন। প্রতিটি অঞ্চলে বসবাসরত তাবেয়ী সেই অঞ্চলে সাহাবীদের জ্ঞান একত্রিত করেন। মক্কাবাসীরা ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর তাফসীর একত্রিত করেন, কূফাবাসীরা একত্রিত করেন ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর তাফসীর। এরপর তাবেয়ীদের যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত তাফসীর সংকলনের ধারাবাহিকতা এভাবেই চলে আসছে।[৫০]

---

* *অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।*
* *অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, ঢাকা।*
[৪৩] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৪৪।*
[৪৪] *মুকাদ্দামাতুত তাফসীর- ইবনু তাইমিয়্যাহ্।*
[৪৫] *সূরা আল আন'আম : ৮২।*
[৪৬] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৩।*
[৪৭] *মুসলিম, ২/১৪৩।*
[৪৮] *আহমাদ- ২২৩৮৪। আহমাদ শাকের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*
[৪৯] *মুকাদ্দামাতুত্ তাফসীর- ইবনু তাইমিয়্যাহ্।*
[৫০] *উসুলুত তাফসীর- খালেদ 'আব্দুর রহমান ইক।*

রাসূল (ﷺ) এর তাফসীর : নিঃসন্দেহে রাসূল (ﷺ) ছিলেন কুরআনের তাফসীরের উৎসস্থল। যেকোনো সাহাবী কুরআনুল কারীমের যেকোনো আয়াত জটিল মনে করলে তার ব্যাখ্যা জানতে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে ছুটে যেতেন।

ইমাম সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন– 'ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ এই বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (ﷺ) সাহাবীদেরকে পুরো কুরআন অথবা কুরআনের অধিকাংশ আয়াতের তাফসীর শিখিয়েছেন। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর একটি বর্ণনাও একথার সমর্থন করে। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন– "সুদের আয়াত অবতীর্ণ হলো, কিন্তু রাসূল (ﷺ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করার আগেই মৃত্যুবরণ করলেন।"[৫১] এই বর্ণনার সারমর্ম এটাই প্রমাণ করে যে, রাসূল (ﷺ) সাহাবাদেরকে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিতেন। কিন্তু সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর খুব দ্রুত তাঁর মৃত্যু হওয়ার কারণে তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে যেতে পারেননি।

হাদীসের কিতাবগুলোর দিকে তাকালেই আমরা এই বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। প্রতিটি হাদীসের কিতাবেই তাফসীর সম্পর্কে আলাদা অধ্যায় রয়েছে। যেখানে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর স্থান পেয়েছে।[৫২] যেমন-

১. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– 'আমি রাসূল (ﷺ)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি প্রস্তুত করো।"[৫৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– "জেনে রাখো! নিশ্চয় শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজি।"[৫৪]

২. ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– 'রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾

"তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত করো।"[৫৫] আয়াতে মধ্যবর্তী সালাত দ্বারা 'আসরের সালাত উদ্দেশ্য।'[৫৬]

৩. আদী ইবনু হাতেম (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর সূত্রে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

"তাদের পথে নয়, যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত এবং যারা পথভ্রষ্ট।"[৫৭] আয়াতে ইয়াহূদীরা আল্লাহর ক্রোধনিপতিত আর খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট।[৫৮]

সাহাবায়ে কিরামের তাফসীর : সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুসারে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ﷺ) সাহাবায়ে কিরামকে কুরআনের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কিন্তু পুরো কুরআনের ব্যাখ্যা করেননি। কেননা কুরআনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত কেউ জানে না। কিছু বিষয় রয়েছে যা আলেমগণই বুঝতে পারবে, কিছু আছে যা আরবরা আরবি ভাষার গতিপ্রকৃতি থেকেই বুঝতে পারবে, অপর কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা মানুষ তাদের সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমেই বুঝতে পারবে, রাসূল (ﷺ)-কে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে, রাসূল (ﷺ) আরবদেরকে আরবি ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ কুরআন তাদের ভাষায়-ই অবতীর্ণ হয়েছে। আবার রাসূল (ﷺ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়, রুহের বাস্তবতা ইত্যাদি মহান আল্লাহর জ্ঞানে লুকায়িত বিষয়সমূহেরও ব্যাখ্যা করেননি।[৫৯]

আমাদের করণীয় সঠিক পদ্ধতি হলো– আমরা প্রথমে কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মধ্যেই উদ্দিষ্ট আয়াতের তাফসীর খুঁজবো। সেখানে না পেলে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসে খুঁজবো। কুরআন এবং হাদীসে খুঁজে না পেলে

---

[৫১] *ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৭৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*
[৫২] *আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন- ড. যাহাবী, ১/৪৫।*
[৫৩] *সূরা আল আনফাল : ৬০।*
[৫৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩/৬৪।*
[৫৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩৮।*
[৫৬] *জামে আত্ তিরমিযী- ১/৩৩৯।*
[৫৭] *সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৭।*
[৫৮] *জামে আত্ তিরমিযী- ৫/২০৪।*
[৫৯] *আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন- ড. যাহাবী, ১/৫৩।*

সেক্ষেত্রে আমরা সাহাবায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করবো। কেননা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল, প্রেক্ষাপট এবং পরিপূর্ণ বুঝ ও সঠিক জ্ঞানের কারণে কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী।[৬০] রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর তারাই কুরআনের ব্যাপারে অধিক অবগত। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরবর্তীদের তুলনায় তাদের মত সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে তাফসীরের ক্ষেত্রে তাদের যে সকল মতভেদ রয়েছে সেগুলোর কোনোটিকে অন্যটি খণ্ডনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কারণ তারা সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। তাদের মতভেদের উদাহরণ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

"আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া– একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।"[৬১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সালামাহ্ ইবনু আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– 'এই আয়াতটি তাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যারা সিয়াম পালন না করে ফিদয়া দিতে চায়। পরবর্তী আয়াতটি এই আয়াতকে মানসুখ বা রহিত করে দিয়েছে।' ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতেও এই আয়াত মানসুখ। কিন্তু ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– 'এই আয়াত মানসুখ নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বয়োবৃদ্ধ নারী-পুরুষ, যারা সিয়াম রাখতে সক্ষম নয়। তারা প্রতিদিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন করে দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার প্রদান করবে।'[৬২]

<u>সাহাবায়ে কিরামের তাফসীরের মানদণ্ড</u> : কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম তাদের ইজতিহাদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করতেন–

১. আরবি ভাষার প্রকাশভঙ্গি জানা : তাদের ও কুরআনের ভাষা একই হওয়ার কারণে কুরআনের যে সকল আয়াতের তাফসীর ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে তারা ভাষাগত বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

২. আসবাবুন নুযুল বা বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা :[৬৩] সাহাবায়ে কিরাম ওহীর সমসাময়িক ছিলেন। তারা ওহী অবতীর্ণের পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই আসবাবুন নুযুল সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন– 'আসবাবুন নুযুল জানা থাকলে কুরআনের মর্মার্থ বুঝা সহজ হয়। কেননা, কারণ সম্পর্কে জানা থাকলে কার্য সম্পর্কে জানা যায়।'[৬৪]

৩. কুরআন অবতীর্ণের সময় আরব উপদ্বীপে বসবাসরত ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অবস্থা জানা : এই বিষয়টি কুরআনের ঐসকল আয়াত বুঝতে সহায়তা করে যেসব আয়াতে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত ও তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়া হয়েছে।

৪. আরবদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানা : কুরআনে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেগুলো আরবদের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

৫. গভীর উপলব্ধি ও বিশেষ বুঝশক্তি : এটা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে দান করেন। কুরআনের এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর অর্থ খুবই সূক্ষ্ম এবং মর্মার্থ উদ্ধার করা দুরূহ ব্যাপার। এসব আয়াতের মর্মার্থ শুধু তারাই সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারেন, যারা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে গভীর বোধ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। এ সকল মহান ব্যক্তিদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) অন্যতম। রাসূল (ﷺ)-এর দু'আর বরকতে তিনি কুরআনের সঠিক মর্মার্থ উদঘাটনে অগ্রগামী ছিলেন।

<u>উপসংহার</u> : 'ইল্‌মে তাফসীর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাসমূহের মধ্যে অন্যতম। তাফসীরের প্রকারভেদ, পদ্ধতি, সংজ্ঞা, মুফাস্‌সিরগণের স্তর, প্রতিটি স্তরের অনুসৃত নিয়মাবলী ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় এ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। লেখক বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পাঠকদেরকে কেবল তাফসীরশাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণাটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেন এর মাধ্যমে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তারা এসম্পর্কে আরো ব্যাপক পড়াশোনা করে তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারেন। মহান আল্লাহই সর্বোত্তম তাওফিকদাতা। ***–অনুবাদক***

---

[৬০] *মুকাদ্দামাতুত্ তাফসীর- ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)।*
[৬১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪।*
[৬২] *সহীহুল বুখারী- ৮/১৭৯-১৮১।*
[৬৩] *আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন- ড. যাহাবী, ১/৮৫।*
[৬৪] *মুকাদ্দামাতুত্ তাফসীর- ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)।*

আলোকিত জীবন

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী : তাফসীর চর্চায় তাঁর অবদান

–প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী*

ভূমিকা : মাওলানা সানাউল্লা অমৃতস্বরী ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক আলেমগণের অন্যতম। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা কলামিস্ট, সফল তার্কিক, বাগ্মী, কথাশিল্পী, অনলবর্ষী বাগ্মী, অবিসংবাদিত ধর্মতত্ত্ববিদ, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ, বরেণ্য সংগঠক, উপস্থিত জবাব আর বাহাস মুবাহাসার পথিকৃত। সর্বোপরি সর্বভারতীয় আহলে হাদীস সংগঠন অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সের আমৃত্যু সেক্রেটারি। তিনি সাধারণত তৎকালীন সময়ে ইসলাম বিরোধী হিন্দুদের প্রকট শ্রেণিবৈষম্য, আর্য সমাজ, সনাতন ধর্ম, দেবসমাজী ছাড়াও ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, পার্সিয়ান, শিখ, প্রকৃতিবাদী, বাহাঈ সম্প্রদায় এবং মির্জা কাদিয়ানী ফিতনাবাজদের সাথে মোনাযারা বা বাহাস করে তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেন। এজন্য তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে শেরে পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবের সিংহ ও ফাতিহে কাদিয়ানী বা কাদিয়ানী বিজয়ী উপাধিতে ভূষিত হন।

জন্ম : মাওলানা সানাউল্লাহ ১৮৬৮ সালের জুন মাসে পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতস্বরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ কাশ্মীরের ইসলামাবাদ হতে অমৃতসরে বসতি স্থাপন করেন। পিতা খিজির জু ও চাচা আকরাম জু কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের মিন্টু শাখা পরিবারের সন্তান ছিলেন। পশমি কাপড়ের ব্যবসার উদ্দেশে অমৃতস্বরে আসেন। তারা ছিলেন তিন ভাই এক বোন। তার অপর দুই ভাই হলেন ইব্রাহিম ও ইসহাক।

শিক্ষাজীবন : সাত বছর বয়সে তিনি পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। চৌদ্দ বছর বয়সে মাতাকে এরপর চাচাকে হারিয়ে অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকেন। এ দুর্যোগ সময়ে বড়ো ভাই মো. ইব্রাহিম-এর কাছে কাপড় রিফু করা শিখে এতে দক্ষতা অর্জন করেন।

একদা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরের দোকানে কাপড় রিপু অবস্থায় একজন আলেম দামি জুব্বা রিপু করার জন্য আসেন। তিনি যথাসময়ে জুব্বাটি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে রিপু করে তাকে দিয়ে দেন। তিনি খুশি হয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি তার সঠিক উত্তর দেন। তাকে পড়াশোনা বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি কেঁদে কেঁদে তার অবস্থার বর্ণনা দেন। তিনি তাকে পড়াশোনার নসিহত করলে রিফুর পাশাপাশি তিনি লেখাপড়া শুরু করেন।

'ইল্‌মে দ্বীনের প্রাথমিক পাঠ্য বই পুস্তকগুলো তিনি অমৃতস্বরের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা আহমাদুল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ আলেম অন্ধ হাফেয মাওলানা আব্দুল মান্নান উযীরাবাদীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর কাছে ২১ বছরের পাঠ সমাপ্তির সনদ গ্রহণ করেন। তিনি সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলুম মাদ্‌রাসায় কিছু দিন শিক্ষা লাভ করে দারুল উলুম দেওবন্দে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের নিকট মানকুলাত ও মাকুলাত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

তিনি দেওবন্দের প্রধান মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর কাছে পড়ার সময় জানার জন্য অনেক প্রশ্ন করতেন। এতে শ্রেণিবন্ধুগণ বিরক্ত হয়ে মাদ্‌রাসা প্রধানকে অভিযোগ করছে অমৃতস্বরী দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে বিদায়ের সময় মাহমুদুল হাসান বলেন, তোমার বিরুদ্ধে অনেক ছাত্র আমাকে অনেক অভিযোগ করেছে। কিন্তু আমি সেগুলোতে কখনো কান দিতাম না। ১৮৮৯ সালে দিল্লির বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাইখুল হাদীস মিয়া নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিসে দেহলভীর নিকট অধ্যয়ন শেষে তিনি হাদীস পাঠদানের অনুমতি লাভ করেন।

১৮৯২ সালে তিনি কানপুরের ফায়যে আম মাদ্‌রাসা ফযীলতের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত হন এবং পাগড়ী লাভ করেন। তার বিদায়ী জলসায় মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী কর্তৃক প্রদত্ত সনদে লেখা ছিল–

هذا الرجل الماهر الكامل والعالم الفاضل الذكي اللوذي اللهوف اليلمعي المولوي محمد ثناء الله على قد غاضب علي فرائد اللالي في ذلك اليم وقد خاض لطلب فوائد الجواهر في ذلك الخضم.

১৯০২ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে মৌলভী ফাজিল উত্তীর্ণ হয়ে সনদ গ্রহণ করেন।

কর্মজীবন : শিক্ষা শেষে তিনি অমৃতস্বরের স্থানীয় তাঈদুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করে মালীর কোটলা মাদ্‌রাসায় মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। এখানে

* *আল কুরআন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

তিনি শিক্ষকতার পরিবর্তে লেখালেখিতে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন। এছাড়া প্রকৃতিগতভাবে তিনি বাহাস-মুবাহিসা ও তর্ক-বিতর্কে পারদর্শী ছিলেন। তাই শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে তিনি জন্মস্থান অমৃতস্বরে ফিরে আসেন।

কানপুর থেকে ফারেগ হওয়ার পর ১৮৯২ তাইদুল ইসলাম মাদ্‌রাসার সভাপতি মাওলানা আহমদ উল্লাহ সানাউল্লাহকে ডেকে পাঠান তার মাদ্‌রাসা এবং শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করেন। ১৮৯৮ সালে মালের কুটলার মাদ্‌রাসা ইসলামিয়া মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। ১৯০০ সালে তিনি এই মাদ্‌রাসার শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে অমৃতস্বরে গিয়ে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

মৃত্যু : মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী ১৯৪৮ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থাবলী : মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী সমকালীন চাহিদার আলোকে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন সময়ে হিন্দুদের প্রকট শ্রেণিবৈষম্য, আর্য সমাজ, সনাতন ধর্ম, দেবসমাজী ছাড়াও ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, পার্সিয়ান, শিখ, প্রকৃতিবাদী, বাহাঈ সম্প্রদায় এবং মির্জা কাদিয়ানী ফিতনা সমাজে ভরপুর ছিল। এছাড়াও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বীর আহলে হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ড তো ছিলই। তিনি তাদের ইসলাম বিরোধী আপত্তিকর বক্তব্যের সুকৌশল লেখনীর মাধ্যমে দাঁতভাঙা জবাব দিতে গিয়ে শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি তাফসীরশাস্ত্রেও চারটি তাফসীর রচনা করেন। তাঁর মূল্যবান কয়েকটি গ্রন্থ হলো– **১.** তাফসীরে সানাঈ; **২.** তাফসীরুল কুরআন বি কালামির রাহমান; **৩.** বায়ানুল ফুরকান আলা ইলমিল বয়ান; **৪.** তাফসীর বির রায়; **৫.** মুকাদ্দামা রাসূল; **৬.** দলিলুল ফুরকান; **৭.** ফাতাওয়া সানাইয়া।

তাফসীর শাস্ত্রে অবদান : কুরআনকে যারা ভালোবাসেন তারা কুরআন চর্চায় জীবনকে উৎসর্গ করে এর হক্ব আদায়ে সচেষ্ট থাকেন। মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী এ ধরনের একজন কুরআন প্রেমিক ছিলেন। বলতে গেলে তিনি তাঁর জীবনের পুরোটাই কুরআন চর্চা, মুসলিম ঐক্য এবং খাঁটি দ্বীন প্রচারে ব্যয় করেন। তিনি নিজেই বায়ানুল ফুরকান আলা ইলমিল বয়ান (بيان الفرقان علي علم البيان) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, ছাত্রজীবনে কুরআন শেখার এবং লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর তা শিক্ষাদানের সুযোগ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। কুরআনের তালমি ও তাফসীরে আমার জীবনকালের চল্লিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাফসীর সাহিত্যে তার অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি তাফসীর শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের চারটি তাফসীর রচনা করে তাফসীর শাস্ত্রে এক বিরাট অবদান রেখে যান। তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ সীরাতে সানাঈতে বলেন, আমার রচনাবলীর চতুর্থ শাখা হলো তাফসীর লিখন। যদিও আমার সকল গ্রন্থ কুরআনেরই খেদমতে নিয়োজিত, তথাপি আমি বিশেষভাবে তাফসীর লেখার ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলাম না।

তাফসীর রচনার কারণ–

তাফসীরুল কুরআন বিকালামির রাহমান (تفسير القران بكلام الرحمن) **:** মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী তাফসীরুল কুরআন বিকালামির রাহমান তাফসীরের প্রথম সংস্করণ ১৯০৩ ও ১৯২৯ তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। ২০০২ সালে রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬৮। সফিউর রহমান মোবারকপুরী এটি সম্পাদনা করেছেন।

কুরআনের তাফসীর কুরআনের মাধ্যমে করা বড়ো উত্তম ও পুণ্যের কাজ। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা অনেকটা কঠিন। বিশেষ করে আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাদীস ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ছাড়া প্রায় অসম্ভব।

তাফসীরের বৈশিষ্ট্য :

১. আয়াতের ব্যাখ্যায় আয়াত উপস্থাপন : উলামায়ে কিরাম কুরআনুল কারীমের তাফসীর করেছেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে। কেউ তাফসীরের ক্ষেত্রে স্বীয় মেধা ও জ্ঞানের সাহায্য নেন। আবার কেউ অন্যের তাফসীর থেকে উপকৃত হয়েছেন। আবার কেউ কুরআনের আয়াতের তাফসীর কুরআনের আয়াত দিয়েই করেছেন। তার 'ইল্‌মী কৃতিত্বের মধ্যে এই তাফসীরটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আল কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, এক জাতীয় আয়াতের মাধ্যমে আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেন। একাজটা অনেক সহজ হতে পারে না, মূলত এটা অনেক কঠিন একটি কাজ। এজন্য প্রয়োজন সমগ্র কুরআন মাজিদকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা ও চিন্তাভাবনা করা। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের সম্পর্ক ভালোভাবে উপলব্ধি করা। কেননা মর্ম উপলব্ধি ব্যতিত এটা কখনো সম্ভব নয়।

অমৃতস্বরী তাফসীর এর নমুনাস্বরূপ সূরা বাক্বারার ৭ নং আয়াত এর তাফসীরে সূরা হাশ্‌রের ১৯ নং আয়াত এবং সূরা আল মায়িদার ১৩ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন।

২. হাশিয়া প্রণয়ন : আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি অস্পষ্ট স্থানগুলো স্পষ্ট করতে হাশিয়া প্রণয়ন করেছেন এবং

সেখানে আয়াতের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করতে হাদীস উপস্থাপন করেছেন।

৩. মতভেদপূর্ণ মাসআলার আলোচনা : বিভিন্ন আয়াতের মাসআলা আলোচনা করতে গিয়ে মতভেদ পূর্ণ মাসআলাগুলো হাশিয়ায় উল্লেখ করেছেন। আবার কোনো কোনো মাস'আলায় আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। যেমন-(استوى على العرش)-এর ব্যাখ্যায় যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। কেননা এ মাস'আলা নিয়ে আরবের অনেকেই তার সাথে মতানৈক্য করেছিল।

৪. মাসআলায় নিজের মতামত ব্যক্ত : কোনো কোনো মাসআলায় নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন আবার কোথাও বা পাঠকের সিদ্ধান্তের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। অমৃতস্বরী একই অর্থবোধক আল কুরআনের এক আয়াতের অন্য আয়াত দ্বারা তাফসীর করেন।

৫. শানে নুযুল উপস্থাপন : তিনি তাফসীরের প্রথম সংস্করণে সংক্ষিপ্তভাবে এবং দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তারিতভাবে আয়াতের শানে নুযুল উল্লেখ করেছেন।

৬. পুরো ব্যাখ্যা স্পষ্ট : সৈয়দ সুলাইমান নদভী বলেন, অমৃতস্বরীর সবচাইতে বড়ো কর্ম হলো তাফসীরুল কুরআন বিকালামির রহমান। তিনি কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর এমনভাবে করেছেন যাতে পূর্ববর্তী আয়াতের পুরো ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে যায়।

৭. হুরুফে মুকাত্তাআত সম্পর্কে আলোচনা : حروف مقطعات প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু কেউ কেউ আন্দাজে কিছু কিছু অর্থ বলেছেন। মাওলানা সানাউল্লাহ সাহেবও এই হরফগুলোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

তিনি الم-এর ব্যাখ্যা দেন যে, (انا الله اعلم) "আমি আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞানী"।

(كهيعص)-এর ব্যাখ্যায় তিনি লি**খেন–** (انا الكا فى والهارى والا مين والالم والصارق) আমি যথেষ্ট পূর্ণতাদানকারী পথ প্রদর্শক, নিরাপত্তাদাতা, সর্বজ্ঞ ও চির সত্যবাদী। তিনি এই আয়াতসমূহের তাফসীর এমনভাবে করেছেন যে, এর উদ্দেশ্য অন্য সামঞ্জস্যশীল আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনেক স্থানে অর্থ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেনি।

৮. তাফসীর সুস্পষ্ট করতে হাদীস উল্লেখ : এ জাতীয় তাফসীরের মধ্যে অনেক বিষয় সুস্পষ্ট হয় না। লেখককে সেগুলো সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য এর সাথে হাদীস উল্লেখ করে দিতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য অন্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

৯. সংক্ষিপ্ত তাফসীর : এ তাফসীরটি তাফসীরে জালালাইনের মতো সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তাফসীরে জালালাইন এর পরিবর্তে পাঠ্যভুক্ত করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি জালালাইনের চেয়ে বেশি উপকারী হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তাফসীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ : যখন এই তাফসীরটি প্রকাশিত হয় তখন এর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ দায়ের করা হয়। এমন কি তাফসীরটিকে রদ করে (العين) নামে একটি পুস্তিকাও বের করা হয়। (আল আইন) যাতে এই তাফসীর সম্পর্কে ৪০টি স্থানে মারাত্মক ভুল হওয়ার আপত্তি করা হয়।

১৩৪৪ সালে মাওলানা সানাউল্লাহ সাহেব যখন হজ্জ করতে মক্কায় যান। তখন বিরোধীরা এই তাফসীরটিকে তাঁর সামনেই বিদ'আত বলে প্রচার করেন। অবশেষে বাদশা আব্দুল আযীয বিন সউদকে এর সমাধানের জন্য উলামাদের একটি কনফারেন্স ডেকে এর সমাধান করেন। মনীষীগণ আরবী এ তাফসীরটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তাফসীর রচনার কারণ : অমৃতস্বরী নিজেই বলেছেন, আমি যতবার পূর্ব ও উত্তরসূরী মুফাস্সিরদের তাফসীর অধ্যয়ন করেছি ততবার তাদের তাফসীরে জটিল ও কঠিন আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখেছি। তাদের কেউ কেউ সারভিত্তিক আবার কেউ বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর করেছেন। অথচ তাফসীরের উত্তম পদ্ধতি হলো কুরআন দিয়ে কুরআন তাফসীর করা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনুগ্রহ করে এ পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছেন । তাই আমি তার রহমতে এ ধরনের তাফসীর রচনা করতে পেরেছি এবং আমি আমার চিন্তা চেতনা নিয়োজিত করেছি চেষ্টা সাধনায় ত্রুটি করিনি।

তাফসীর সম্পর্কে মন্তব্য : ১৯০৩ তাফসীরটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হলে আরব বিশ্বসহ বিভিন্ন দেশ হতে এ তাফসীরের অনেক প্রশংসামূলক মন্তব্য করেন বিভিন্ন মাযহাব ও মাসলাকের আলেমগণ। নিম্নে এর কিছু দেওয়া হলো–

১. মিশরের প্রখ্যাত পত্রিকা আল আহরাম ও আল মানার –এ তাফসীরের উপর একটি রিভিউ প্রকাশিত হয়। সেখানে তাকে ভারতের অন্যতম সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

২. মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী বলেন, কুরআন দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যার যে পদ্ধতি সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী অনুসরণ করেছেন তাফসীর চর্চা এটি সুন্দরতম পদ্ধতি।

৩. মাওলানা শিবলী নোমানী বলেন, তাফসীরটি অধ্যয়নে আমার কাছে স্পষ্ট তো হয়েছে যে এটি জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য এটি অন্যতম উপকারী তাফসীর। কুরআন দিয়ে কুরআন তাফসীর করা এ ধরনের পদ্ধতি সাধারণত পাওয়া যায় না।

৪. আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী বলেন, সংক্ষিপ্ত তাফসীরগুলোর মধ্যে মাওলানা অমৃতস্বরীর তাফসীরটি উত্তম।

৫. বিশিষ্ট গবেষক আব্দুল মমিন নদবি বলেন, এ তাফসীরটি ভারত এবং ভারতের বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর। এর রচনাশৈলী অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

৬. জামিয়া আল আরাবিয়া পত্রিকার সম্পাদক তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর তাফসীরটি দামি মোকতা ও মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মুসলিম বিশ্বে এ ধরনের আধুনিক তাফসীরের প্রয়োজন অত্যাধিক।

২. তাফসীরে সানাঈ (التفسير الثنائي) **:** উর্দু ভাষায় আট খণ্ডে তাফসীরে সানাঈ রচিত। এই তাফসীরটি শুধু পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাই নয়; এতে আছে মুসলিম এবং অমুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অসংখ্য প্রশ্নের জবাব। তিনি তৎকালীন সময়ের উপযোগী গবেষণা এবং ফিকহী মাসায়েলগুলো কুরআনের আলোকে সুবিন্যাস করেন। যারা হাদীস ছাড়া তাফসীর বুঝার ধৃষ্টতা দেখায় তাদেরও যথার্থ জবাব রয়েছে এ গ্রন্থে। মূলকথা হলো– তাফসীর সানাঈ যেন সে যুগের বিভিন্ন গোত্র এবং মাযহাবসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অমৃতস্বরের কাছে এ দু'টি তাফসীর অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল।

তাফসীর রচনার কারণ : তিনি তাফসীর রচনার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. কুরআন সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদের জানাশোনা ধ্যান-ধারণা একেবারেই কম। জনসাধারণের অনেকেই আরবি হরফ পর্যন্ত চিনেন না, তাদের পক্ষে আরবি তাফসীর পড়া তো দূরের থাক সেটার মূলভাব অর্থ তারা জানতে পারে না। এ সাধারণ মুসলমানরা কুরআন থেকে একেবারেই অন্ধকারে, তাই আমি এমন ধরনের একটি তাফসীর রচনার চিন্তাভাবনা করি যাতে তারা কুরআন থেকে উপকার পেতে পারে। তাছাড়া তাফসীরগুলো অনেক বড়ো ভলিয়মে রচিত। এত বড়ো বড়ো তাফসীর জনগণ পড়তে ভয় পায়। সেজন্য আমি ছোট্ট পরিসরে একটি তাফসীর রচনার নিয়ত করি।

২. ইসলাম ও কুরআন বিরোধীরা কুরআন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান বা ধ্যান ধারণা না থাকার কারণে তারা নিজেদের সবজান্তা হিসেবে জাহির করতে কসুর করে না। এমনকি তারা কুরআন সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকে, কারণ হলো কিছু উর্দু তাফসীর যেগুলো কুরআন সঠিকভাবে বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক নয় অথচ কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনের জন্য গভীর জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। এদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমালোচনার জবাব দেওয়া সময়ের অপরিহার্য দাবি ছিল, এ কারণে দু'টোকে সামনে রেখে আমি তাফসীরে সানাঈ রচনা করি।

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী বলেন, কুরআনের এ ধরনের তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষের চাইতে আলেমদের জন্য বেশি অনুভূত হতে থাকে, তাই তিনি আলেমদেরকে তাফসীর অধ্যয়নের আহ্বান জানান।

তাফসীরে সানাঈ-এর বৈশিষ্ট্য :

১. মাওলানা অমৃতস্বরী সহজ সাবলীল অসাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় আয়াতের অনুবাদ করেন।

২. অমৃতস্বরী তাফসীরের শুরুতে একটি ভূমিকা রচনা করেছেন। এ ভূমিকার কিছু সংক্ষিপ্ত দলিলের মাধ্যমে নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করেন।

৩. সাধারণ জনগণ যাতে সহজে উপকৃত হতে পারে তাফসীর থেকে এজন্য তিনি তাফসীরটির শব্দে শব্দে কুরআন অনুবাদ করেছেন।

৪. তিনি তাফসীরের বিভিন্ন আয়াত স্পষ্ট করতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক হাশিয়া সংযোজন করেছেন।

৫. তার তাফসীরে উর্দু ভাষার রচনাশৈলী পরিলক্ষিত হয়েছে।

৬. তাফসীরে বিভিন্ন আয়াতের পারস্পরিক মুনাসিবাত বা সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. তিনি আয়াতের তাফসীরে সমকালীন বিভিন্ন মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তৎকালীন প্রচলিত বিরোধী ফেরকার মধ্যে অন্যতম ছিল আর্য সমাজ সনাতনধর্মী, কাদিয়ানী, শিয়া, বেরলভী প্রকৃতিবাদী, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান।

৮. অনুবাদের পর তিনি সহজ ভাষায় আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন।

তাফসীর প্রকাশনা : মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরীর দ্বিতীয় তাফসীর হলো তাফসীরে সানাঈ। ১৮৮৫ সালে এর প্রথম খণ্ড এবং ১৯৩১ সালে এর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাফসীরটি উর্দু ভাষায় মোট আট খণ্ডে সমাপ্ত। তাফসীরটি মাওলানা অমৃতস্বরীর ৩৬ বছরের সাধনার ফসল।

তাফসীরটি প্রকাশনার ব্যাপারে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। যেমন- কুদসীয়া লাইব্রেরী, লাহোর এবং সালাফীয়া লাইব্রেরী, শীষ মহল রোড, লাহোর।

তাফসীরের গ্রহণযোগ্যতা : এ তাফসীরটি উর্দু ভাষাভাষীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সর্বমহলে প্রশংসিত এবং গ্রহণযোগ্য অনন্য সাধারণ একটি তাফসীর। বিশিষ্ট গবেষক আব্দুল মবিন নদবী বলেন, তার তাফসীরগুলোর মধ্যে এ তাফসীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকারী কুরআন প্রেমী আলেম-ওলামা এবং গবেষকদের মাঝে এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

৩. বায়ানুল ফুরকান আলা ইলমিল বয়ান (بيان الفرقان علي علم البيان) **:** এ গ্রন্থটিও একটি তাফসীর গ্রন্থ। 'ইল্‌মে বয়ান ও ইলমে মায়ানীর সৌন্দর্যসমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই লেখকের এই প্রয়াস; কিন্তু সূরা আল বাক্বারাহ্ পর্যন্ত লেখার পর এ বিষয়টি আর অগ্রসর হয়নি, তবুও লেখকের উদ্যোগটি ছিল প্রশংসনীয়।

এটি আরবি ভাষায় রচিত একটি উৎকৃষ্ট তাফসীর। ১৯৩৪ সালে এ তাফসীরটি প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয় এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০।

তাফসীরের শিরোনাম দেখলেই বুঝা যায় তিনি তাফসীরটি বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রের আলোকে রচনা করেছেন। তিনি অলংকার শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাফসীর রচনা করেন।

তিনি সূরা আল ফাতিহাহ্ এবং সূরা আল বাক্বারার তাফসীর নিয়ে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করেন। তাফসীরের শুরুতে তিনি একটি সারগর্ভ ভূমিকাও রচনা করেন এতে তিনি অলংকার শাস্ত্রের 'ইল্‌মুল মানি এলমুল বয়ান বাদীর ৭২টি বিধি-বিধান উল্লেখ করেন।

তাফসীর-এর বৈশিষ্ট্য :

১. তিনি সূরার তাফসীর এর শুরুতে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেন।

২. সূরার অবতীর্ণ স্থান এবং আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেন।

৩. সূরার মর্যাদা বা মাহাত্ম্য উল্লেখ করেন।

তার তাফসীরটি এত গ্রহণীয় হয়েছে যে, পরবর্তীতে ভারতের বিভিন্ন তাফসীরকারক তাদের তাফসীরের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এদের মধ্যে মওলানা হামিদ উদ্দিন ফারাহি (১৮৩৩-১৯৩০) ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১৮৬৩-১৯৪৩) অন্যতম।

তাফসীর বির রায় (تفسيربالراي) **:** শিরোনামেই বুঝা যায় যে, তাফসীরটিতে গতানুগতিক তাফসীর নেই, রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস এবং সাহাবীদের বাণীর উদ্ধৃতি নেই, তবে রায় দ্বারা তাফসীর করলে কি কি শর্তাবলী ও নিয়মাবলী অনুসরণ করা উচিত এসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে এতে। এ তাফসীর গ্রন্থটিও অসমাপ্ত ছিল কেবল সূরা আল ফাতিহাহ্ ও আল বাক্বারার তাফসীরে। তবে তাফসীর গ্রন্থসমূহ যে রায় দ্বারা তাফসীর করে ভুল করা হয় সেদিকে লেখক সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন।

উপসংহার : মাওলানা সানাউল্লা অমৃতস্বরী তথাকথিত আলিম ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক খ্যাতিমান ধর্মতত্ত্ববিদ, সাংবাদিক, কলামিস্ট, অবিসংবাদিত মোনাযির বা বিতার্কিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ। সর্বোপরি তিনি শুধু অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সের আমৃত্যু সেক্রেটারি ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইসলাম বিরোধীদের যমদূত। তৎকালীন ইসলাম বিরোধী কাদিয়ানী, আর্য সমাজ, খ্রিষ্টান, শিয়া, আহলুল কুরআনসহ সকল পথভ্রষ্টদের কুরআন সুন্নাহর আলোকে বাহাস মোনাযারায় দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইসলাম বিরোধী সকল অপপ্রচেষ্টা তিনি সমূলে উৎপাটন করেন। একারণে তিনি শেরে পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবের সিংহ ও ফাতিহে কাদিয়ানী বা কাদিয়ানী বিজয়ী উপাধিতে ভূষিত হন।

ভারতীয় উপমহাদেশের মাওলানা সানাউল্লা অমৃতস্বরী শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান ধর্মতত্ত্ববিদ এবং খাঁটি দ্বীনের সফল প্রচারক। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনায়াসেই চার পাঁচটি পিএইচডি ডিগ্রি হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. *শেরে পাঞ্জাব মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী- ড. নূরুল ইসলাম।*
২. *বাযমে আরজুমান্দ- মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টি।*
৩. *উপমহাদেশে আহলে হাদীসের ইতিহাস ও ঐতিহ্য- প্রফেসর এ কে এম সামসুল আলম।*
৪. *তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস- প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী।*
৫. *আধুনিক মুফাস্‌সির- প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী।*
৬. *আহলে হাদীস আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।*
৭. *কুরআনে কারীম কী হিন্দুস্তানী তারাজিম আওর তাফাসীর কা ইজমালী জাইযা- গোলাম মুহাম্মদ আঞ্জুম।*
৮. *হিন্দুস্তানী মুফাস্‌সিরী আওর উনকী আরবী তফসীরী- ড. মুহাম্মদ সালিম কিদওয়াঈ।*
৯. *জাইযাতি তারাজিমে কুরআনী- আব্দুল কাদির দেহলভী।*

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-জুলায়খার কাহিনী ও আমাদের সমাজ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নিয়ে সর্বাধিক আলোচিত ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রধান দুই চরিত্রের নাম সরাসরি উল্লেখ হয়নি। সূরা ইউসুফে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ক্রয়কারীকে 'আজিজ' বা মন্ত্রী হিসেবে এবং তার স্ত্রীকে 'আজিজের স্ত্রী' বা 'তার স্ত্রী' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে তাফসীর এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে, এই আজিজের স্ত্রীই হলেন ইতিহাস-খ্যাত 'জুলায়খা'। আবার অনেকের মতে, তাঁর প্রকৃত নাম রঙ্গিল আর উপাধি হলো জুলায়খা। সূরা ইউসুফের ২১ নং আয়াত অনুসারে, মিসরের যে ব্যক্তি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেন এবং এই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল– 'এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করো, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি' এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিলাম। আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পাদনে জয়ী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।"[৬৫]

এভাবেই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এবং জুলায়খার পরিচয় হয় এবং 'জুলায়খার ঘরেই কৈশোর পেরিয়ে যুবক হয়ে ওঠেন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)। জুলায়খা ক্রমেই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহপ্রদত্ত ঈমানের শক্তিতে সব ধোঁকা ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং সব সময় জুলায়খাকে এ পথ ছাড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রেমে পাগল 'জুলায়খা ছিলেন একরোখা।

সূরা ইউসুফের ২৩ নং আয়াত অনুসারে একদা জুলায়খা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে ঘরে পেয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং তার প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান, ধৈর্য, ঈমান এবং ভীতির কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বন্ধ দরজার দিকে দৌড়ে যান।

এ সময় 'জুলায়খা পেছন থেকে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে টেনে ধরলে তার পরিধেয় জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে যায়। অলৌকিকভাবে এ সময় ঘরের বন্ধ দরজা (কারও মতে বাইরে থেকে বন্ধ দরজা) খুলে যায় এবং ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও জুলায়খা দরজার বাইরে 'জুলায়খার স্বামী আজিজকে দেখতে পায়। ঠিক তখনই চতুর জুলায়খা তার ভোল পাল্টে ফেলে এবং সূরা ইউসুফের ২৫ নং আয়াত অনুসারে এ সময় ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো বা অন্য কোনো কঠিন শাস্তির দাবি করে। ২৬ নং আয়াতে বর্ণিত, এ সময় ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) প্রকৃত সত্য তুলে ধরেন এবং জুলায়খার পরিবারের একজন সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

"তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পেছন হতে তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলল, তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল। স্ত্রীলোকটি বলল– 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোনো মর্মন্তুদ শাস্তি

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৬৫] *সূরা ইউসুফ : ২১।*

ব্যতীত আর কী দণ্ড হতে পারে?' ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বলল– 'সে-ই আমার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিল।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো– 'যদি ওর জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী।"[৬৬]

পবিত্র কুরআনে এই সাক্ষ্য প্রদানকারীর বিস্তারিত পরিচয় নেই। তবে তাফসীর এবং প্রচলিত বর্ণনা অনুসারে এই সাক্ষী ছিল একটি নিতান্ত কন্যাশিশু, যার মুখে তখনো স্পষ্ট করে কথা ফোটেনি।

অপর বর্ণনায় এই শিশু জুলায়খার আত্মীয় এক বোনের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনা মতে সাক্ষীর যুক্তি ছিল ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জামা যদি পেছন থেকে ছেঁড়া থাকে তবে জুলায়খা দোষী এবং যদি সামনে থেকে ছেঁড়া থাকে তবে জুলায়খা যা বলছে তা সত্য অর্থাৎ- ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) দোষী।

স্বামী আজিজ যখন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জামা পেছন থেকে ছেঁড়া দেখতে পান তখন সব সত্য প্রকাশিত হয়। মান-সম্মানের কথা বিবেচনা করে এ ঘটনা যাতে বাইরের কেউ না জানে আজিজ তার শাস্তির নির্দেশ দেন এবং স্ত্রী জুলায়খাকে শাস্তির ভয় দেখান।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও জুলায়খার এ কাহিনী নিয়ে 'প্রেম কইরাছেন ইউসুফ নবী' এই গজলের কলি আমাদের গ্রাম-বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে সবার মুখে মুখে। অথচ এ বচন সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর এ মিথ্যা বচনকে ভিত্তি করে যুবসমাজ বলে থাকে 'প্রেম পবিত্র, স্বর্গীয় প্রেম।' সাধারণত প্রেম বলতে মানুষ বিয়ে-পূর্ব কিংবা বিয়েবহির্ভূত নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্ককে বুঝানো হয়। আমাদের সমাজব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ককে প্রেম শব্দে ব্যক্ত করতে খুব একটা দেখা যায় না।

বিয়েবহির্ভূত কিংবা বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসার সম্পর্ককে ইসলাম নাজায়িয সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করে। কোনো নবী এমনকি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে বা পরে এ ধরনের সম্পর্ক কিংবা কাজে এক মুহূর্তের জন্য লিপ্ত হননি। প্রত্যেক নবী নবুওয়াত লাভের আগে ও পরে নৈতিক চরিত্রে শতভাগ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও নির্মল ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, নারী-পুরুষে কথিত প্রেম হারাম। আর হারাম কাজ মাত্রই অপবিত্র। তাই পবিত্র প্রেম বলে বাস্তবে কিছু নেই। প্রতিটি হারাম কাজের পরিণতি জাহান্নাম।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি জুলায়খার ভালোবাসা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা। মন্ত্রী বধূ জুলায়খা তরুণ কৃতদাস ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রেমে উন্মাদিণী ছিল। তাকে নিজের মতো করে পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই জুলায়খা করে। ধন-সম্পদ আর ক্ষমতার মোহে অন্ধ 'জুলায়খা তার লালসা চরিতার্থ করতে সামাজিক মান-সম্মান হারানোর ভয়, বান্ধবীদের তিরস্কার সব কিছু উপেক্ষা করে। এ ক্ষেত্রে জুলায়খা যতটা উষ্ণতা দেখিয়েছে, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সর্বোচ্চ পরিমাণের শীতলতা। জুলায়খার মনের আকাশে ঝড়ের গতি যত তীব্র ছিল, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর আকাশ ছিল ততই শান্ত, স্থির ও নির্লিপ্ত। আপন গৃহকর্তার স্ত্রী, তিনি আবার মন্ত্রী জায়া। একদিকে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক, অন্যদিকে ক্ষমতার প্রতাপ আর চোখ ঝলসানো রূপ– কোনোটাই কাজে লাগেনি। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে–

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾

"রাজা নারীদের বলল– 'যখন তোমরা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) হতে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কী হয়েছিল?' তারা বলল– 'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তাঁর মধ্যে কোনো দোষ দেখিনি।' 'আজিজের স্ত্রী বলল– 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ হলো, আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম; সে তো সত্যবাদী।"[৬৭]

জুলায়খার এই নোংরা কাহিনিকে কি প্রেম ভালোবাসা বলা যায়? আর যারাই বা বলছেন, তারাই বা কোন বিবেকে বলছেন? কোন যুক্তিতেই বা একজন নবীর নামে এমন ডাহা মিথ্যা তথ্য যুগের পর যুগ ধরে অপপ্রচার হচ্ছে। ❑

[৬৬] *সূরা ইউসুফ : ২৫-২৬।*

[৬৭] *সূরা ইউসুফ : ৫১।*

বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

ভ্রান্তির আবর্তে সওমে রামাযান

"রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : সওম বা রোযা দ্বীনের গুরুত্ব রুকন। এ মাসে মুসলিমগণ একমাস সিয়াম পালন করেন। সিয়াম পালনের পাশাপাশি অতিরিক্ত নফল 'ইবাদত, দান-সাদাক্বাহ্ ইত্যাদির প্রতি অন্য মাসের তুলনায় অধিক মনোযোগী হন। কারণ এ মাসের নেক কাজের সাওয়াব দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়! এই মহিমান্বিত মাসেও একশ্রেণির মুসলিম 'ইবাদতের নামে বিদআতে লিপ্ত; ফলে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ'র পাল্লা ভারি হচ্ছে। আমাদের সওম ও এ মাসের অন্যান্য 'ইবাদত যেন ত্রুটিমুক্ত হয়, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

নিম্নে আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত রামাযান মাস সংক্রান্ত কিছু বিদআতী কাজের চিত্র তুলে ধরা হলো–

০১. রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে বিদ্আত : রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কিছু লোক চাঁদের দিকে হাত উঁচু করে শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে থাকে। এটা বিদআত। কেননা কুরআন-সুন্নাহ'তে এর কোনো ভিত্তি নেই। তবে নতুন চাঁদ দেখলে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলাম। রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ চাঁদকে আমাদের মাঝে বরকত, ঈমান, শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে উদিত করো। আমার ও তোমার রব আল্লাহ তা'আলা।[৬৮]

০২. সাহ্রি সংক্রান্ত বিদআত : দেখা যায়, রামাযান মাসের শেষ রাতে মুআয্যিনগণ মাইকে উচ্চ আওয়াযে কুরআন তিলাওয়াত, গজল, ইসলামী সংগীত ইত্যাদি গাওয়া শুরু করেন অথবা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে বক্তাদের ওয়াজ, গজল বাজাতে থাকেন। সেই সাথে চলতে থাকে ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার, উঠুন, সাহ্রির সময় হয়েছে, রান্না-বান্না করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন ইত্যাদি বলে অনবরত ডাকাডাকি। কোথাওবা কিছুক্ষণ পরপর উঁচু আওয়াজে হুইশেল বাজানো হয়।

এর থেকে আরো আজব কিছু আচরণ দেখা যায়। যেমন- এলাকার কিছু যুবক রামাযানের শেষ রাতে মাইক নিয়ে এসে সম্মিলিত কণ্ঠে গজল বা কাওয়ালী গেয়ে মানুষের বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে চাঁদা আদায় করেন। অথবা মাইক বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকেন। এছাড়াও এলাকা ভেদে বিভিন্ন বিদআতী কার্যক্রম দেখা যায়।

আমাদের জানা উচিত, শেষ রাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিচের আসমানে নেমে আসেন। এটা দু'আ কবূলের সময়। আল্লাহ তা'আলার নিকট এ সময় কেউ দু'আ করলে, তিনি তা কবূল করেন। মুমিন বান্দাগণ এ সময় তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, আল্লাহ তা'আলার দরবারে রোনাযারী করে থাকেন। সুতরাং মাইক বাজিয়ে, গজল গেয়ে এই মহামূল্যবান সময়ে 'ইবাদতে বিঘ্নিতা সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে গুনাহর কাজ। এতে মানুষের ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটানো হয়। যার ফলে অনেকের সাহ্রি এমনকি ফজরের নামায পর্যন্ত ছুটে যায়। এই কারণে অনেক রোযাদার সাহ্রির শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব না করে আগেভাগে সাহ্রি শেষ করেন। এসবই গুনাহের কাজ।

তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে এ ক্ষেত্রে সুন্নাহ কী?

এ ক্ষেত্রে সুন্নাহসম্মত কাজ হচ্ছে, ফজরের আগে সাহ্রির জন্য আলাদা একটি আযান দেওয়া। এই আযান হলো সাহ্রি খাওয়ার জন্য এবং তারপর ফজর সালাতের জন্য আরেকটি আযান দেওয়া। রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে দু'জন মুআয্যিন নিয়োগ করা ছিল। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ».

[৬৮] *মুসনাদ আহমাদ- তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ৩/৪২০, হা. ১৩৯৭, আত্ তিরমিযী- অনুচ্ছেদ : চাঁদ দেখার সময় কী বলবে? হা. ৩৪৫১, আল্লামা আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।*

"বিলাল রাতে আযান দেয়। অতএব তোমরা বিলালের আযান শুনলে পানাহার করতে থাকো, ইবনু উম্মু মাকতুমের আযান দেয়া পর্যন্ত।"[৬৯]

সুনান আন্ নাসায়ী'র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; নবী ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا» يَعْنِيْ : فِي الصُّبْحِ».

"বিলাল আযান দেয় এজন্য যে, যেন ঘুমন্ত লোক জাগ্রত হয় আর তাহাজ্জুদ আদায়কারী ফিরে আসে অর্থাৎ- নামায বাদ দেয় এবং সাহ্‌রি খায়।"[৭০]

সুতরাং এ দু'টির বেশি কিছু করতে যাওয়া বিদআত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এজন্যই উলামায়ে কিরাম বলেছেন : "যেখানে একটি সুন্নাত উঠে যায়, সেখানে একটি বিদআত স্থান করে নেয়।" আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। সুন্নাত উঠে গিয়ে সেখানে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি স্থান দখল করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পুনরায় সুন্নাতের দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন –আমীন।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে এলাকায় দু'টি আযান দেওয়ার প্রচলন নেই, সেখানে রামাযান মাসে হঠাৎ করে দু'টি আযান দেওয়া ঠিক নয়। কেননা এতে মানুষের মাঝে সাহ্‌রি খাওয়া ও ফজর সালাতের সময় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

০৩. সাহ্‌রি খাওয়ার সময় মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা বিদআত : সাহ্‌রি খাওয়া একটি 'ইবাদত। আর যে কোনো 'ইবাদত কবূল হওয়ার জন্য নিয়ত অপরিহার্য শর্ত। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"সকল 'আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"[৭১]

তাই রোযা রাখার জন্য নিয়ত থাকা অপরিহার্য। নবী ﷺ বলেছেন :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

"যে রাতে (ফজরের আগে) রোযা রাখার নিয়ত করেনি তার রোযা হবে না।"[৭২]

কিন্তু জানা দরকার, নিয়ত কী এবং কীভাবে নিয়ত করতে হয়।

নিয়ত কী এবং তা কীভাবে নিয়ত করতে হয়?

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মনের মধ্যে কোনো কাজের ইচ্ছা করা বা সিদ্ধান্ত নেয়াকেই নিয়ত বা মনের সংকল্প বলা হয়। সুতরাং রোযা রাখার কথা মনের মধ্যে সক্রিয় থাকাই নিয়তের জন্য যথেষ্ট। মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা ইসলামী শরিয়তে কোনো 'ইবাদতের নিয়ত মুখ দিয়ে উচ্চারণের কথা আদৌ প্রমণিত নয়।

অথচ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ওযূর নিয়ত, নামাযের নিয়ত, সাহ্‌রি খাওয়ার নিয়ত ইত্যাদি চর্চা করা হয়। নামায শিক্ষা, রোযার মাসায়েল শিক্ষা ইত্যাদি বইতে এ সব নিয়ত আরবীতে অথবা বাংলা অনুবাদ করে পড়ার জন্য জনগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, দ্বীনের মধ্যে এভাবে নতুন নতুন সংযোজনের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে আমাদের এই দ্বীনে এমন নতুন কিছু তৈরি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যাজ্য।"[৭৩]

তাই মুসলিমদের কর্তব্য হলো– দলিল-প্রমাণ ছাড়া গদবাঁধা নিয়তসহ সবধরনের বিদআতি কার্যক্রম পরিত্যাগ করা এবং সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন।

০৪. বিলম্বে ইফতার করা : কিছু রোযাদারকে দেখা যায়, স্পষ্টভাবে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও অতি সর্তকতার কারণে আরও কিছুক্ষণ পরে ইফতার করেন। এটি স্পষ্ট সুন্নাহবিরোধী কাজ। কারণ নবী ﷺ বলেছেন :

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ.

"মানুষ ততদিন কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।"[৭৪]

---

[৬৯] *বুখারী- অনুচ্ছেদ : ফজরের আগে আযান দেওয়া, ৬২২, মুসলিম- অনুচ্ছেদ : ফজর উদিত হলে রোযা শুরু হবে, হা. ৩৮/১০৯২।*

[৭০] *সুনান আন্ নাসায়ী- মা. শা., হা. ৬৪১, সহীহ।*

[৭১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১।*

[৭২] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৩১, ২৩৩২, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

[৭৩] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৭/১৭১৮।*

০৫. তারাবীহ নামায সংক্রান্ত বিদআত : অনেক মসজিদে দেখা যায়, তারাবীর নামাযে প্রতি চার রাকআত শেষে মুসল্লীগণ উঁচু আওয়াজে 'সুবহানাল্লা হিল মুলকে ওয়াল মালাকূতে' দু'আটি পাঠ করে থাকেন। এভাবে নিয়ম করে এই দু'আ পাঠ করা বিদআত। অনুরূপভাবে এ সময় অন্য কোনো দু'আ এক সাথে উঁচু আওয়াজে পাঠ করাও বিদআত। কারণ এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোনো সহীহ হাদীস নেই।

০৬. তারাবীর নামাযে খুব তাড়াতাড়ি কুরআন তিলাওয়াত করা বা তাড়াহুড়া করে নামায পড়া : অনেক মসজিদে রামাযানে তারাবীর নামাযে খুব তাড়াতাড়ি কুরআন তিলাওয়াত করা বা তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করা হয়। যার কারণে তিলাওয়াত ঠিক মতো বুঝাও যায় না। নামাযে ঠিকমত দু'আ-জিকিরও পাঠ করা যায় না। এটা নিঃসন্দেহে সুন্নাহ পরিপন্থি। কেননা আল্লাহর নবী ﷺ-এর রাতের ক্বিয়ামুল লাইল হতো অনেক দীর্ঘ এবং ধীরস্থির।

০৭. বদর দিবস পালন করা বিদআত : দ্বিতীয় হিজরির রামাযনের সতের তারিখে বদরের প্রান্তরে মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়, রাসূল ﷺ এবং তার জানবাজ সাহসী সাহাবয়ে কিরামের মাঝে এক যুগান্তকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ছিল অস্ত্র-সম্ভার এবং জনবলে এক অসমযুদ্ধ। মুসলিমগণ অতি নগণ্য সংখ্যক জনবল আর খুব সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে কাফিরদের বিশাল অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর প্রতিরোধ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে দিন অলৌকিকভাবে মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্য সূচিত হয়েছিল।

এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু প্রতি বছর রামাযানের ১৭ তারিখে এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। তারপর বদরের বিভিন্ন ঘটনা, সাহাবীদের সাহসিকতা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। এভাবে প্রতি বছর এই দিনে 'বদর দিবস' পালন করা হয়। যদিও আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এটির প্রচলন তেমন নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের কিছু ইসলামী সংগঠন প্রতি বছর বেশ জোরেশোরে সাংগঠনিক কার্যক্রম হিসেবে এই বিদআত পালন করে থাকেন। অথচ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সর্বোত্তম আদর্শ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং সালাফে সালেহীন থেকে এ জাতীয় অনুষ্ঠান পালনের কোনো ভিত্তি নেই। বদরের এ ঘটনা নিঃসন্দেহে মুসলিমদের প্রেরণার উৎস। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এভাবে দিবস পালন করা শরিয়তসম্মত নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, নবী ﷺ-এর নবুওয়াত জীবনে রয়েছে অনেক বক্তৃতা, সন্ধিচুক্তি এবং বিভিন্ন বড়ো বড়ো ঘটনা, যেমন- বদর, হুনাইন, খন্দক, মক্কা বিজয়, হিজরত মুহূর্ত, মদিনায় প্রবেশসহ বিভিন্ন বক্তৃতায়, যেখানে তিনি দ্বীনের মূল ভিত্তিগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তিনি তো এ দিনগুলোকে আনন্দ-উৎসব হিসেবে পালন করা আবশ্যক করেননি; বরং এ জাতীয় কাজ করেন খ্রিষ্টানরা। তারা 'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎসব হিসেবে পালন করেন। অনুরূপভাবে ইয়াহুদিরাও এমনটি করেন। ঈদ-উৎসব হলো শরিয়তের একটি বিধান। আল্লাহ তা'আলা শরিয়ত হিসেবে যা দিয়েছেন তা অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করা যাবে না যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

মূলতঃ এ জাতীয় কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকা মানুষকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শরিয়ত থেকে দূরে রাখার অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং শরিয়ত যে কাজ করতে আদেশ করেনি, তা হতে দূরে অবস্থান করে রামাযান মাসে অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায আদায় করা, জিকির-আযকার এবং অন্যান্য 'ইবাদত-বন্দেগী বেশি বেশি করা দরকার। কিন্তু মুসলিমদের অন্যতম সমস্যা হলো শরিয়ত অনুমোদিত 'ইবাদত বাদ দিয়ে নব আবিষ্কৃত বিদআতী 'আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন –আমীন।

০৮. জুমু'আতুল বিদা পালন করা : আমাদের দেশে দেখা যায়, রামাযানের শেষ শুক্রবারে জুমু'আতুল বিদা পালন করা হয়। এ উপলক্ষে জুমু'আর নামাযে প্রচুর ভিড় পরিলক্ষীত হয়। অথচ কুরআন-সুন্নাহয় এ ব্যাপারে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। আমাদের কর্তব্য প্রত্যেক জুমু'আকে সমান গুরুত্ব দেওয়া। শেষ জুমু'আর বিশেষ কোনো ফযীলত আছে বলে কোনো প্রমাণ নেই। ❑

[৭৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫৭ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮/১০৯৮।*

নিভৃত ভাবনা

তিন বন্ধুর গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ

–আব্দুর রউফ*

মক্কাবাসীকে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। কাবার চত্বরে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন কুরআন তিলাওয়াত করেন, কাফিররা বুঝতে পেরে তাঁর উপর হামলা চালায়। তারা কুরআনের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। কুরআনের সম্মোহনী সুর শুনে কেউ যাতে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হয় সেজন্য প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করাটা তারা মেনে নেয়নি। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মারধর করে তারা বুঝিয়ে দিলো– মক্কায় প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ।

নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোজ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করেন। আমাদের সময়ের ক্বারিদের কুরআন তিলাওয়াত শুনে আমরা কতো মুগ্ধ হই। যার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছিল, তাঁর তিলাওয়াত কতোই না মনমুগ্ধকর ছিল!

মধ্য রাত। চারিদিক নিরব, নিস্তব্ধ। নবীজীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরের তিনপাশে তিনজন আড়ি পেতে আছে। মক্কার কাফিরদের দুই নেতা– **১. আবূ জাহেল** (আবূ জাহেলের আসল নাম 'আম্‌র)। তার পিতার নাম হিশাম এবং মাতার নাম হানজালিয়া। **২. আবূ সুফিয়ান**। তাদের সাথে আছে আরেকজন, তার নাম **৩. আখনাস ইবন শুরায়ক**। মজার ব্যাপার হলো– সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছে, কেউ জানতো না অপর পাশে আরেকজন আছে।

এই মধ্য রাতে তারা তাদের চিরশত্রুর ঘরে জড়ো হয়েছে কেনো? তাকে হত্যা করতে? না। তারা বরং এমন একটা কাজ করতে জড়ো হয়েছে, দিনের বেলা যেই কাজটিকে তারাই 'নিষিদ্ধ' করেছে।

তারা জড়ো হয় নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুললিত কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে! সারা রাত কুরআন তিলাওয়াত শুনে ভোরবেলা বাসায় ফেরার জন্য সবাই রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে একজন আরেকজনের সাথে দেখা হলো। ভূত দেখার মতো অবস্থার মতো একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আরে, তুমি এখানে?"

"আমারও তো একই প্রশ্ন, তুমি এখানে কী করো?"

সবাই বুঝতে পারলো যে, সবাই-ই একই উদ্দেশ্যে মাঝরাতে তাদের চিরশত্রুর বাড়িতে জড়ো হয়েছে। একজন আরেকজনকে তিরস্কার করে বললো, "আমরা এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনছি, এটা প্রচার হয়ে গেলে তো লোকেরা আমাদেরকে খারাপ ভাববে!" সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, আর এভাবে আসবে না।

কিন্তু, কুরআনের টান তাদেরকে বিছানায় থাকতে দিলো না। আবারো মধ্যরাতে তারা জড়ো হলো নবিজীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরের পাশে। সবাই ভেবেছিল, 'আমি আসছি, এটা হয়তো কেউ জানবে না'। ভোরবেলা বাড়ি ফেরার সময় আবারো তিনজনের দেখা। আবারো আগের দিনের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তৃতীয় রাত। আবূ জাহেল, আবূ সুফিয়ান, আখনাস ইবনু শুরায়ক তিনজন আবারো একত্রিত হলো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে। কী এক দোটানায় আছে তারা। না পারছে আর দশ জনের মতো ইসলাম গ্রহণ করতে, না পারছে জনসম্মুখে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দিতে, না পারছেন লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে। আজকে তৃতীয়বারের মতো সবাই সবার কাছে ধরা খেলো। কিন্তু, আজকে তারা শক্ত সিদ্ধান্ত নিলো। এ রকম করলে চলবে না। মক্কার কাফিররা, অর্থাৎ- তাদের কর্মীরা যদি শুনে যায় যে, দিনে নেতা যা নিষেধ করে, রাতে সেটাই সে উপভোগ করে, তাহলে তো তাদের আর মান-সম্মান থাকবে না। *[১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

* *শুব্বান সভাপতি, ঢাকা জেলা।*

মহিলাজগৎ

বিভিন্ন ধর্ম সভ্যতায় নারী ও তার অধিকার

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

ভূমিকা : নারী মহান স্রষ্টার এক রহস্যময় ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। সুখ ও সাচ্ছন্দময় জীবণধারায় নারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারী ছাড়া স্বর্গ-সুখও যেন অসম্পূর্ণ তাইতো মহান স্রষ্টা প্রথম মানুষ, আদি-পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর অসম্পূর্ণ সুখে পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য তার সহধর্মিনী মা হাওয়াকে তারই বাম পাঁজরের একটি হাড় হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের হতে এ পৃথিবীতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে নারী মানব-সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর অধিকার বলতে বুঝায়– হক্ব, প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদান করার অর্থ হচ্ছে– তার হক্ব, প্রাপ্য ও পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। সুতরাং নারীর অধিকার বলতে বুঝায়– পরিবার-সমাজ, রাজনীতি-অর্থনীতি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর যথাযথ মূল্যায়ণ। এককথায় নারীর অধিকার বলতে বুঝায়– প্রাতিষ্ঠানিক, আইনানুগ, আঞ্চলিক সংস্কৃতি দ্বারা সিদ্ধ বা কোনো সমাজের আচরণের বহিঃপ্রকাশ, নারী স্বাধীনতা। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নারীরা আজও অবহেলিত, নির্যাতিত, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। আর এ জন্যই নারীদের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে– 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডিও)'। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ সনদে স্বাক্ষর করে।

বিভিন্ন ধর্মে নারী অধিকার : বিভিন্ন ধর্ম নারীর অধিকারকে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করেছে। কোনো কোনো ধর্ম নারীকে তার অধিকারের সামান্য একটু অংশও দেয়নি; বরং তাদেরকে আরো বেশি অধিকার বঞ্চিত করেছে। নিম্নে সেরকম কয়েকটি ধর্ম ও তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো–

হিন্দু ধর্মে নারী আধিকার : হিন্দু ধর্মের পবিত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদ, উপনিষদ, পুরাণ শাস্ত্রের কিছু কিছু জায়গায় নারীকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতায়নকারী হিসেবে উল্লেখ করলেও তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কিছু ঘটনা, বিধান, সংস্কৃতি, নারীর প্রতি সহিংসতা ও নিষ্ঠুর আচরণ নারী অধিকার খর্ব করে। রামায়ন ও মহাভারত এ দু'টি মহাকাব্যে নারীর ভূমিকা মিশ্রভাবে চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতের প্রধান নারী চরিত্র 'দ্রৌপদী' পাঁচটি পাণ্ডবের সাথে বিবাহিত। রামায়ণে সীতাকে সম্মানিত ও অবিচ্ছেদ্য প্রিয় হিসেবে দেখানো হলেও রামের আদর্শ স্ত্রী ও সঙ্গি হিসেবে গৃহিণীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় বিধানে রয়েছে 'দৈব বিবাহ' নামে একপ্রকার বিবাহ। এ বিবাহের ধরণ হচ্ছে পাত্রীর পিতা-মাতা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাত্রীর বিয়ের জন্য অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে উপর্যুক্ত পাত্রের সন্ধান না মিলে, উপর্যুক্ত পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে না পারলে পরিবার পুরোহিতের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পারফরম্যান্সের সময় ম্যাচ মেকিংয়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে তাদের আবদ্ধ করবে। মিত্র-শত্রুর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরেও এধরনের পাত্রীদেরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে বাধ্য করা হত। এ ধর্মে আরো একটি বিয়ে রয়েছে 'পৈশাচ বিবাহ' নামে। এ বিবাহের ধরণ হচ্ছে– লোকচুরি করে কোনো পুরুষ যদি ঘুমন্ত নেশা বা মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জিত কোন মেয়েকে প্ররোচিত করে তবে তাকে 'পৈশাচ বিবাহ' বলা হয়। আধুনিক যুগে এটিকে 'ডেট রেপ' বলা হয়। যা বেশিরভাগ সভ্যদেশে একটি অপরাধ বলে নিন্দা করা হয়। একসময়ে হিন্দু ধর্মে নারীদের বলি দেওয়ার ও সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। এ ধর্মে তাদেরকে অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হতো। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে– There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ- নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর জগতে নেই। নারী প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।[৭৫] নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে আরো বলা হতো– Men should not love their অর্থাৎ- নারীদেরকে ভালোবাসা পুরুষদের উচিত নয়।[৭৬] এই ধর্মে– এখনো নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী অধিকার : বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অল্প-কিছু ইতিবাচক চিত্র থাকলেও পিটকা সুত খেরাবদে এমন

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামে'আ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[৭৫] *নারী- আব্দুল খালেক, (ঢাকা : দ্বীনী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৪।*

[৭৬] *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার- সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিজামী (ঢাকা : সালাউদ্দিন বইঘর, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ২২।*

উদাহরণও রয়েছে যা নির্বাণ ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য নারীর জন্য বাধা। গবেষক ডায়ানা পল বলেছেন– "প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মের সময়" ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নারীদের ভূমিকা পুরুষদের থেকে নিকৃষ্ট ছিল এবং অন্যান্য গবেষকরা বলেছেন যে, ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক যুগে নারী একটি 'ঘৃণার জাত' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মে একজন নারী পাঁচটি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। তিনি কখনো ব্রহ্মা, সাকুরা বা বুদ্ধের রাজা হতে পারেন না। এটি গৌতম বুদ্ধের পালি ক্যাননে নিকায়া মাঘিমার বোদাটোকা সূত্রের উপর ভিত্তি করে বলা হয়– নরীদের "আলোকিতদের একজন হওয়া অসম্ভব।" বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন– Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ- মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে তার মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে যা বিশ্বের সকল মনকে অন্ধ করে দেয়।[৭৭]

ইয়াহূদী ধর্মে নারী অধিকার : ইয়াহূদী ধর্মের ভাষ্য অনুযায়ী– 'পুরুষ সৎকর্মশীল ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট, আর নারী ভণ্ড ও বদস্বভাবের। নারীর উপর রয়েছে সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ। নারীর কারণে সকলের ধ্বংস অনিবার্য।[৭৮] এ ধর্মে সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি আবশ্যিক। কিন্তু নয়জন পুরুষ ও অসংখ্য নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো না। কারণ নারী মানুষরূপেই গণ্য হয় না। নারী ছিল তাদের কাছে উপেক্ষার পাত্রী।[৭৯] এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে– সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভালো। তারা নারীকে সকল প্রকার পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসেবে গণ্য করতো। ইয়াহূদী উত্তরাধিকারী আইনে মৃত ব্যক্তির মা, কন্যা, বোন, স্ত্রী যাই হউক না কেন (নারী হওয়ার কারণে) সে তার উত্তরাধিকারিনী হবে না। এমনকি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে যদি তার কোনো পিতা, দাদা, পুত্র, ভাই, চাচা না থাকে তবুও নারীরা তাতে উত্তরাধিকারিণী হবে না। এই ক্ষেত্রে তার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে ঐ ব্যক্তি, যে সে সম্পত্তি জোর-যবরদস্তি করে দখল করবে। তিন বছর পর্যন্ত তার কাছে এটা আমানত হিসেবে থাকবে। এ সময়ের মাঝে কোনো উত্তরাধিকারী না পাওয়া গেলে সম্পত্তি তার হয়ে যাবে। এই ধর্মে নারীর সম্মান একজন জারজ সন্তান অপেক্ষায়ও নিম্নমানের। কেননা একজন জারজ সন্তানও এ ধর্মের উত্তরাধিকারী আইন অনুযায়ী পিতা-মাতার সম্পত্তিতে বৈধ উত্তরাধিকার। জারজ সন্তান যদি কারো প্রথম সন্তান হয় তাহলে সে অন্য বৈধ পুত্রসন্তানেরও দিগুণ সম্পত্তি পাবে।

খ্রিষ্ট ধর্মে নারী অধিকার : খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল অনুসারে নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের কারণেই যিশুকে শূলবরণ করতে হয়েছে। খ্রিষ্টসমাজ নারীকে আত্মাহীন প্রাণী ও সন্তান উৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেছে।[৮০] খ্রিষ্ট ধর্মযাজক মোস্তাম বলেন– নারী এক অনিবার্য আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।[৮১] তাদের অন্য এক পাদ্রীর মতে, 'নারী যাবতীয় পাপের উৎস। নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল এবং তারা আল্লাহ তা'আলার মান-সম্মানে বাধা দানকারী।[৮২] অন্য একপাদ্রীর বর্ণনা মতে– নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী। ঘরে ও সমাজে যত অশান্তি সৃষ্টি হয় সব তারই কারণে। আর এ কারণেই তারা নারীকে শিক্ষা থেকেও দূরে রেখেছিল।[৮৩] বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে– 'পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনান্তে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।[৮৪] যিশু খ্রিষ্ট বলেছেন– আমাকে কেউ সম্পদ বন্টনকারী বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেননি। তাই প্রচলিত ইঞ্জিলে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোন বিধিবিধান না থাকলেও পূর্ব থেকেই তাদের মধে প্রচলিত আছে– পূত্রই হবে সকল সম্পদের উত্তরাধিকার। এখানে নারীর কোনো অধিকার থাকবে না।

---

[৭৭] *The position of womanin Islam- Nazhat Afza and khurshid Ahmad, (Kuwait Islamic Book publishers, 1982), p. 9-10.*

[৭৮] *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা- বোর্ড অফ এডিটরস, শিকাগো : ম্যাক্রোপিডিয়া, ১৯৯৫, ১৫তম ভলিউম।*

[৭৯] *Shaner, Donald W: A Christian viwe of Divorce, Leiden: 1969, p. 31.*

[৮০] *নারী স্বাধীনতা : ইসলাম ও পাশ্চাত্য বিশ্ব- জাফর, ঢাকা : পালাবদল পাবলিকেশন্স লি., ২০০১, পৃ. ৭৩।*

[৮১] *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী- ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪।*

[৮২] *পর্দা ও ইসলাম- সাইয়্যেদ আবুল আলা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ১০।*

[৮৩] *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী- পৃ. ১৪।*

[৮৪] *Holy Bible- Genesis, 3 : 16, p, 4.*

বিভিন্ন সভ্যতায় নারী অধিকার : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সিমন দা বেভোয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না; বরং নারী হয়ে উঠে।' বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন সমাজে সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের নামে কিংবা কোন ধর্ম বা আইনের দোহাই দিয়ে নারীকে অধস্তন করে রাখা হয়েছে। বঞ্চিত করা হয়েছে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। নেম্নে তাদের অধিকার বঞ্চিত কয়েকটি সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত হলো–

চীন সভ্যতায় : চীন সভ্যতায় নারীদের অবস্থা কেমন ছিল তা ফুটে উঠে 'হু সুয়ান' নামক এক কবীর কবিতায়। তিনি লিখেন "নারী হওয়া বড়ো দুঃখের, পৃথিবীতে কোনো কিছুই নারীর মতো এত সস্তা নয়।" চীন সভ্যতায় নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন– 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মতো নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই। বিখ্যাত চৈনিক ধর্মের প্রবক্তা সাধু কনফুসিয়াসের বক্তব্য হলো– "নারীর মূল কাজ আনুগত্য, শৈশব কৈশোরে পিতার, বিয়ের পর স্বামী, এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের, এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র। মধ্যযুগীয় চীনা মেয়েদের পা ছোট করে রাখার কুপ্রথা এবং কনফুসীয় অপদর্শন সেই খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকেই নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পথটি রুদ্ধ করে রেখেছে চীন সভ্যতায়।

গ্রীক সভ্যতা : গ্রীক পৌরাণিক শাস্ত্রের এক কাল্পনিক নারী যার নাম "প্যানডোরা"। বিশ্ব মানবতার সকল দুর্ভাগ্যের মূলে সে নারী। তাই গ্রীকরা নারীকে প্রায় মানুষ অর্থাৎ- মানুষ নয় মানুষের মত মনে করত। গ্রীক সভ্যতায় নারীদের সত্যিকারের চিত্র সক্রেটিসের ভাষায় বেশ ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন– Woman is the greatest source of chaos and disruption in the world. She is like the deafly Tree which outwardly looks beautiful, but if sparrows eat it they die without fail. অর্থাৎ- নারী জগতের বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর, কিন্তু চড়ুই পাখি তা ভক্ষণ করলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে।[৮৫] নারীদের তখনকার অবস্থার বর্ণনায় এন্ডারস্কি বলেন– Cure is possible for fire burns and Snake-bite: but it is impossible to arrest woman's charms. অর্থাৎ- অগ্নিদগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য সম্ভব। কিন্তু নারীর সৌন্দর্যকে এড়িয়ে চলা অসম্ভব।[৮৬] তাই বারবনিতালয় গ্রীক মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে পতিতাদের প্রভাব ছিল বেশ লক্ষণীয়। পতিতালয়কে মূল্যায়ণ করা হতো উপাসনালয়ের মতো। পতিতারা ছিল তাদের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবি এফ্রোডাইটের প্রতিনিধি। যে তার স্বামীকে ত্যাগ করে অপর তিন দেবতার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল। গ্রীক সভ্যতায় নারীর চেয়ে যেন পতিতাদের সম্মানই বেশি ছিল।

রোম সভ্যতা : বিশ্বসভ্যতার এক বিস্ময়কর নাম রোমান সভ্যতা। সে সভ্যতায় কেবল পুরুষেরই জয়জয়কার ছিল। নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা ছিল কার্যত বন্দি। পিতা ও স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছা তখনই নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারত। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত এমন কি তারা ইচ্ছে করলে নারীকে দাসী হিসেবে বিক্রিও করে দিতে পারত। রোমীয় এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থা এতটাই করুণ ছিল যে, এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নারী প্রাণহীন দেহ! রোমীয় সমাজে নারী একটি অপবিত্র বস্তু হিসেবে বিবেচিত হত। গোস্ত খাওয়া, হাসি-তামাসা করা কিংবা কথা-বার্তা বলা তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। যাতে কথা বলতে না পারে সে জন্য তাদের মুখে লোহার তালা লাগানো হতো।[৮৭]

ব্যবিলনীয় সভ্যতা : ব্যবিলনীয় আইনে নারীর কোনো ধরনের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তাদের মান-মর্যাদা তো দূরের কথা ন্যূনতম বাঁচার অধিকারটুকুও যেন ছিল না। কোনো পুরুষ যদি ঘটনাক্রমে কোনো নারীকে হত্যা করতো তাহলে তাকে শাস্তি না দিয়ে; বরং তার স্ত্রীকে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

মিশরীয় সভ্যতা : মিশরীয় সভ্যতায় রাজদরবারে নারীদের একটি স্থান থাকলেও রাজকার্যে তাদের কোনো অধিকারই ছিল না। সিংহাসনের অধিকার মূলত রাজ পরিবারের নারীদের উপর ভিত্তি করে সঞ্চালিত হত। ফলে প্রত্যেক রাজাকে নিজ অধিকার বৈধ করার জন্য রাজ-উত্তরাধিকারিণীকেই বিয়ে করতে হতো। এ জন্য ভাই-বোনের মধ্যেও বিবাহ সংঘটিত হত। পাশ্চাত্য মিশরীয় গবেষক Diodors-এর মতে– "It was a law in Egypt, against the custom of all other nations that brothers and sisters might marry one with another." অর্থাৎ- অন্যান্য সকল প্রথার বিরুদ্ধে এটি মিশরের একটি আইন ছিল যে, ভাই ও বোন একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে। এটি শুধু রাজ পরিবারে সিংহাসনের অধিকার

[৮৫] *ইসলামে নারীর অবস্থান- নাজহাত আফজা এবং খুরশীদ আহমেদ, পৃ. ৯-১০, ইসলামিক বই প্রকাশক, কুয়েত, ১৯৮২।*

[৮৬] *ইসলামে নারীর অবস্থান- নাজহাত আফজা এবং খুরশীদ আহমেদ, পৃ. ৯-১০, ইসলামিক বই প্রকাশক, কুয়েত, ১৯৮২।*

[৮৭] *মুকারানাতুল আদইয়ান- আহমাদ শিলবি, ২/১৮৮।*

রক্ষার জন্যই হত। এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের কন্যাকেও এ জন্য বিবাহ করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'Sneferu' বং 'Ramsessu II'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এক কথায় মিশরীয় সভ্যতায়ও স্বার্থের জন্য নারীকে যেরূপ ইচ্ছে ব্যবহার করা হতো।

ইসলামপূর্ব যুগে নারীর অধিকার : প্রাক-ইসলাম যুগে নারীর কোনো অধিকার ছিল না। তারা ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অধিকার হারা জাতি। তাদেরকে শুধু ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও বাজারের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মানব সমাজে তাদের সামাজিক অধিকার তো ছিলই না। অনেকাংশে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও তাদের ছিল না। কন্যা সন্তানকে তারা লজ্জাজনক অভিশাপ বলে মনে করত। তাই সদ্য জন্ম নেয়া নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে তারা মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। তাদের এহেন গর্হিত কর্মকে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[৮৮]

সে সময়ে তাদের উপর খুবই কঠোর আচরণ করা হতো। তাদেরকে মনে করা হতো দাসী কিংবা ভারবাহী পশু হিসেবে। তাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। একজন পুরুষ যতখুশি স্ত্রী গ্রহণ করত। ইচ্ছে হলে স্ত্রীকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিত। কিংবা উপহার হিসেবে কারো কাছে পাঠাত। আবার স্ত্রীকে অন্যের কাছে পাঠিয়ে ঋণের শোধ দিত। সুন্দরী নারী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে টাকা উপার্জন করত। এ গর্হিত কাজ হতে তাদের বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যবিচারে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়।"[৮৯]

এক কথায় ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের যথেচ্ছা ব্যবহার করা হতো, তাদের কোনো অধিকারই ছিল না।

ইসলামে নারী অধিকার : ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে দিয়েছে সম্মান ও মর্যাদা। দিয়েছে তাদের পূর্ণ অধিকার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কে দিয়েছে সমমর্যাদা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে একের উপর অন্যের অধিক মর্যাদা। যিশু খ্রিষ্টের মা মারিয়মের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন– "বস্তুত কোনো পুত্র এ কন্যার সমকক্ষ নয়।"[৯০]

[৮৮] *সূরা আত্ তাকভীর : ৮-৯।*
[৮৯] *সূরা আন্ নূর : ৩৩।*
[৯০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৬।*

আবার নারীদের উপরও পুরুষদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা বলেন– "স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব।"[৯১] সুতরাং বুঝা যায় ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে পুরুষ-নারীতে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। উভয়কে সমমর্যাদা দিয়েছে। প্রতিটা আসনে নারী-পুরুষের মর্যাদা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মা হিসেবে নারীর অধিকার : ইসলামে মা হিসেবে একজন নারীর যথেষ্ট সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়ে বলছেন–

"আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি– তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম ও সুন্দর আচরণ করে। (বিশেষ করে মায়ের সাথে কেননা) সে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর দুধ পান করায়। সুতরাং আমার (আল্লাহর) প্রতি এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই (আল্লাহরই) কাছে।"[৯২] আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো- হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে বেশি কার? রাসূল (ﷺ) বললেন– তোমার মা। সে বলল- তারপর কে? তিনি বললেন– তোমার মা। সে আবারও বলল- তারপর কে? তিনি বললেন– তোমার মা। সে পুনরায় বলল- তারপর কে? তিনি বললেন– তোমার পিতা।[৯৩] সুতরাং বুঝা গেলো ইসলাম নারীকে মা হিসেবে যথেষ্ট অধিকার দিয়েছে।

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার : ইসলাম দিয়েছে স্ত্রীর যথোপযুক্ত অধিকার। তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–"সাবধান! স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।"[৯৪] একটি হাদীসে এসেছে– "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ ও ব্যবহারের দিক থেকে সর্বোত্তম। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।"[৯৫] হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ্ কুশায়রি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে তার বাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর

[৯১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২৮।*
[৯২] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৪।*
[৯৩] *সহীহুল বুখারী- পর্ব : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় : মানুষের মাঝে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার কে অধিক হক্বদার, হা. ৫৯৭১।*
[৯৪] *সূরা আন্ নিসা : ১৯।*
[৯৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাগণের মর্যাদা, পরিচ্ছেদ : রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের মর্যাদা, হা. ৩৮৯৫।*

রাসূল (ﷺ)! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন– তুমি নিজে যখন আহার করবে তখন তাকেও খাবার দিবে। যখন কাপড় পরিধান করবে তখন তাকেও কাপড় দেবে। তার মুখের উপর মারবে না। ভর্ৎসনা করবে না তথা তাকে অশ্লীল গালি দিবে না এবং তাকে ত্যাগ করে ঘরের বাইরে ফেলে রাখবে না।[৯৬]

স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার : ইসলাম নারীকে শুধু অধিকারই দেয়নি; বরং বিয়েতে নারীর মতামত এমনকি স্বামী নির্বাচনেও নারীর অধিকার দেয়া হয়েছে। যার ফলে যে কেউ ইচ্ছা করলেই বলপূর্বক কোনো নারীর স্বামী হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "হে পুরুষগণ! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করতে বাধা প্রদান করো না।"[৯৭] রাসূল (ﷺ) বলেছেন– স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন– হে রাসূল (ﷺ)! কুমারীর সম্মতি কিভাবে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন– তার নীরবতাই তার সম্মতি।[৯৮]

দেন মোহরের অধিকার : ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামীর সাধ্য অনুসারে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে মোহর প্রদান করো।"[৯৯] এই মোহর স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড় পরিমাণও হতে পারে। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফত কালে বিয়ে-শাদি সহজ করার জন্য তিনি একবার মোহর কম নির্ধারণ করার নির্দেশ দেন। তখন এক মহিলা আপত্তি করে বললেন– আল্লাহ তা'আলা তো কুরআন মাজীদে বলেছেন– "তোমরা যদি কিনতার (স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ) পরিমাণ মোহরও তাকে দিয়ে থাকো, তবে তা থেকে তা গ্রহণ করো না।"[১০০] এ কথা প্রমাণ করে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ পরিমাণও মোহর হতে পারে। তাহলে আপনি বড়ো অংকের মোহর প্রদানে বাধা দিচ্ছেন কেন? এ কথা শুনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন– তার কথাই ঠিক। অধিক পরিমাণে মোহর নির্ধারণে বাধা প্রদান করা ঠিক নয়।[১০১]

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার : কন্যা হিসেবেও ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে। কন্যা সন্তান জন্মলাভ করা মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। মহানবী (ﷺ) বলেন– কন্যা সন্তান বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক। অন্য বর্ণনায় এসেছে– রাসূল (ﷺ) বলেছেন– যার তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন আছে অথবা দু'টি কন্যা বা দু'টি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে উত্তমভাবে জীবন অতিবাহিত করে। তাদের হক্বসমূহ আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বিনিময়স্বরূপ জান্নাত প্রদান করবেন।[১০২]

পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার : ইসলাম নারীকে শুধু অধিকারই দেয়নি; বরং সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীও বানিয়েছে। তাই পিতার সম্পত্তিতে রয়েছে কন্যার অধিকার। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন– "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন। এক ছেলে দুই কন্যার সমান অংশ পাবে। আর যদি শুধু কন্যাগণ দুইয়ের অধিক হয় তা হলে তারা পাবে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি কন্যা মাত্র একটি হয় তাহলে সে পাবে সম্পত্তির অর্ধাংশ।"[১০৩] এ আয়াতে শুধু কন্যাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীই বানায়নি; বরং সম্পত্তিতে কন্যার অংশের উপর ভিত্তি করে পুত্রের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

মায়ের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার : পিতার সম্পত্তিতে কন্যার যেমন অধিকার রয়েছে। তেমন অধিকার রয়েছে মায়ের সম্পত্তিতে মেয়ের। মায়ের সম্পত্তিতেও এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের সমান অংশ। অর্থাৎ- মেয়ে পাবে ছেলের অর্ধেক।

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার : মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে অর্থাৎ- নিঃসন্তান হলে স্ত্রী পাবে এক তৃতীয়াংশ। আর মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান (ছেলেমেয়ে) থাকে তাহলে মৃতের স্ত্রী পাবে এক ষষ্ঠাংশ।[১০৪]

মোটকথা : পূর্বের কোনো সভ্যতা কিংবা কোনো ধর্ম নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে পারেনি। একমাত্র ইসলাম ধর্মই সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীকে অন্ধকার থেকে টেনে এনে আলোর পথ দেখিয়েছে। দিয়েছে যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা। শিখিয়েছে শ্রেষ্ট নারী হওয়ার কৌশল। সুতরাং হে মুসলিম বোন! অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম না করে ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করো; তবেই তুমি তোমার যথোপযুক্ত সম্মান-গৌরব ও অধিকার ফিরে পাবে। ❑

---

[৯৬] *সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : বিবাহ, পরিচ্ছেদ : স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার, হা. ২১৪২।*
[৯৭] *সূরা আল বাক্বারাহ : ২৩২।*
[৯৮] *সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিম, মিশকাত- হা. ৩১২৬।*
[৯৯] *সূরা আন্ নিসা : ৪।*
[১০০] *সূরা আন্ নিসা : ২০।*
[১০১] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- ১/৪৬৮ পৃ.।*
[১০২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৮৮।*
[১০৩] *সূরা আন্ নিসা : ১১।*
[১০৪] *সূরা আন্ নিসা : ১১।*

ইতিহাস-ঐতিহ্য

মুসলিম জাতির ভারত শাসন

(৭১২-১৮৫৭ খ্রি.) প্রায় ১১৪৫ (এক হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ) বছর

–মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম*

মহানবী মুহম্মদ (ﷺ)-এর উপর কুরআন নাজিল হয় ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। নবুওয়াতের দায়িত্ব আসার সাথে সাথে কর্মপরিধি ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন, তথা আন্তর্জাতিক জীবনে বিস্তৃত হয়।

"আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[১০৫]

তাই তিনি কোনো নির্ধারিত ভূখণ্ডের জন্য নয়। আরবদেশ এবং আরব দেশের বাহিরে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটিয়ে মানুষের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে মানবতার কল্যাণে কাজ করতে নির্দেশ প্রদান করে কুরআনে ঘোষণা এসেছে–

"এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো মক্কা ও এর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১০৬]

মহানবী (ﷺ) মক্কায় ইসলাম প্রচার ও মানবতার কল্যাণে কাজ করেন ৬১০-৬২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৬২২-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মদীনায়। মক্কায় ১৩ বছর মদীনায় ১০ বছর মোট ২৩ বছর। প্রথম খলিফা আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। নবী (ﷺ) ইন্তেকালের সাথে সাথে রাষ্ট্রের অভন্তরে ভণ্ড নবীদের বিদ্রোহ দেখা দিলে তা শক্ত হাতে দমন করতে এবং রাসূলের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ করতেই তার শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে, তিনি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

'উমার ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাসন কাল ছিল (৬৩৪ খ্রি. থেকে ৬৪৪ খ্রি. পর্যন্ত) মোট ১০ বছর। সে সময় ইসলামের প্রসার ঘটে তিনটি মহাদেশ জুড়ে। যেমন- এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা। তাঁর সময় মুসলমানগণ মিশর, স্পেন, পারস্য ইরাক, হীরা রোম, সিরিয়া, ফিলিস্তিনি, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, আল-বসরা, কিরমান, খোরাসান, মাকরান, সিজিস্তান, আজারবাইজান, বুখারা, আফগানিস্তান, বলখ, গজনী পর্যন্ত ইসলামী খিলাফত পৌঁছে যায়। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতকাল (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ১২ বছর।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফত (৬৫৬-৬৬১) ৬ বছর কাল। খিলাফতের মোট সময়কাল ৩০ বছর। ইসলামের আবির্ভাবের একশত বছর পর ভারত উপমহাদেশে ইসলামের সূর্যোদয় হয়। আরব মুসলিমগণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন নবী (ﷺ)-এর ইন্তেকালের একশত বছর পর (৭১০ খ্রি.)।

ঐতিহাসিকগণের মতে, 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতকালে ওমান হতে ভারতবর্ষের উপকূলে প্রথম (৬৩৬-৬৩৭ খ্রি. পর্যন্ত) একটি অভিযান প্রেরণ করেন। উত্তাল সমুদ্রে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নৌ-অভিযান প্রেরণ 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পছন্দ করতেন না এবং এ কারণেই পরবর্তী সময়ে ভারত বর্ষের উপকূলের উপর কোনো অভিযান প্রেরণ করা হতে তিনি বিরত থাকেন। ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসনকালে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনে রাবী কিরমান অধিকার করে সিজিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। এরপর 'আব্দুল্লাহ বিজয় অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা পোষণ করলেও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুমতি দেননি। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন।

উমাইয়া বংশের শাসনকাল শুরু হয় (৬৬১ খ্রি.), তাদের মোট শাসনকাল ৯০ বছর। উমাইয়া বংশের প্রথম শাসক মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তাঁর শাসন কাল (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) ১৯/২০ বছর। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। দেশ বিজেতা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উত্তর আফ্রিকা বিজয় তাঁর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরপর তিনি, মিশর, আধুনিক লিবিয়া ও তিউনিসিয়া ইফ্রিকিয়া এবং বর্তমান আলজেরিয়া ও মরোক্কের মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁর শাসনে নিয়ে আসেন। এরপর ইয়াযিদ ও দ্বিতীয় মু'আবিয়ার শাসন (৬৮০-৬৮৩) ৩/৪ বছর। প্রথম মারওয়ানের শাসন (৬৮৪-৬৮৫) ১ বছর। এরপর 'আব্দুল মালিকের শাসন (৬৮৫-৭০৫) ২০ বছর কাল। এরপর প্রথম ওয়ালিদের শাসন (৭০৫-৭১৫) ১০ বছর কাল। আল ওয়ালিদের শাসনামলে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ সসৈন্যে উপমহাদেশের সিন্ধু অববাহিকায় ভারতের মুলতানে আসেন। মুলতানের শাসক রাজা দাহির, তার দেশে মুসলিম ব্যবসায়ীর জাহাজ জলদস্যু কর্তৃক সিন্ধুতে লুণ্ঠিত হলে, উত্তর ইরাকের মুসলিম শাসক রাজা দাহিরকে কৈফিয়ত তলব করলে, তিনি উত্তর দেন জলদস্যুরা তার এখতিয়ারের বাহিরে। অন্যদিকে মুসলিম বিদ্রোহীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে

---

* *বিএ অনার্স এম এ (রা. বি.) এম এ (ডাবল) (জা. বি.) এম এম, সহকারী অধ্যাপক, (এমডিএমবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।*

[১০৫] *সূরা আল আম্বিয়া- : ১০৭।*

[১০৬] *সূরা আশ্ শূরা- : ৭।*

আসছিল বহুদিন থেকেই, সে অভিযোগ পূর্বে থেকেই ছিল। তাছাড়া হিন্দু সম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত ছিল, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় দ্বারা নির্যাতিত ছিল।

প্রথমত হিন্দুরা বৈষ্ণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, ব্রাহ্মণ এই চার শ্রেণি আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, যেমন- দাস, বসাক, সাহা, পাল, ঠাকুর, শীল, সূত্রতধর, দত্ত, ব্যানার্জি, চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, গুপ্ত, হালদার, রায়, কায়স্থ বড়াল, কর্মকার, বণিক, চৌহান, বাঘেলা, চান্দেল, সেন, পল্লব, চানুক্য রাষ্ট্রকূট, পাণ্ড্য, চৌল ও চেরা নামে বংশ ছিল। অনেক বংশের নিজস্ব রাজ্য ছিল। কেউ কাউকে পছন্দ করতো না। একজন আরেকজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করে চলতো। নির্যাতিত জনগোষ্ঠী চাইতো শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্য শাসকের আগমন হোক।

সিন্ধু নদীর অববাহিকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারই নাম সিন্ধু সভ্যতা। এখানে যারা বসবাস করতো তাদেরকে বলা হতো সিন্ধী। কালের আবর্তনে শব্দ পরিমার্জিত হয়ে হিন্দি বা হিন্দু হয়েছে। তবে হিন্দু কোনো ধর্মের নাম নয়, আসলে তাদের ধর্মের নাম সনাতনধর্ম। যে ধর্মেরই হোক, ইন্ডিয়ায় যারাই বসবাস করে তাদেরকে সিন্ধী অথবা হিন্দি বলা যায়। যেমন- রোমলাসের নাম অনুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভরত নামক একজন শাসকের নাম অনুসারে ভারত নামকরণ করা হয়েছে। সেখানে তখন কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। ভারত রাজ্য ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত ছিল, যেমন- দিল্লি, আজমীর, কাশ্মীর, বুন্দেলখণ্ড, কনৌজ, মালব, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম।

আরবের মুসলিমগণ ভারতে এসে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করেন দিল্লিকে রাজধানী করে। আরব মুসলিমদের প্রথম শাসক, তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের শাসন ৭১২ খ্রি. থেকে ৭১৫ খ্রি. পর্যন্ত। ৭১৫ খ্রি. থেকে ৭৪২ খ্রি. পর্যন্ত মুসলিম স্থায়ী সরকার ছিল না। নিয়োগ হয়েছে, হয়েছে অপসারিত। মাঝখানে আড়াইশত বছর পর যে সব মুসলিম ভারতে আসেন তারা আরব নয়, তারা নব দীক্ষিত তুর্কী মুসলিম। গজনী বংশের আলপ্ততাগীনের শাসন ৯৬২ খ্রি. থেকে ৯৭৬ খ্রি. পর্যন্ত। সবুক্তগীনের শাসন ৯৭৭ খ্রি. থেকে ৯৯৭ খ্রি. পর্যন্ত। সুলতান মাহমুদ ৯৯৭ খ্রি. থেকে ১০৩০ খ্রি. পর্যন্ত, তবে এর মধ্যেই অনেক উত্থান পতন হয়েছে। গজনী বংশের শাসনকাল ছিল ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মোট শাসক সংখ্যা ১৬জন। গজনী বংশের সর্বশেষ শাসক মালিক খসরু মোহাম্মদ ঘুরী (১১৮৬ খ্রি.)'র নিকট আত্মসমর্পণ করে গজনীর সিংহাসনে বসেন।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনে দ্বিতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। এই বংশে ৫ জন শাসক ছিলেন ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর দাস বংশ শাসন করেন (১২০৬-১২৯০ পর্যন্ত) ৮৪ বছর কাল। কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬-১২১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। আরাম শাহ ১২১০-১২১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইলতুৎমিশ ১২১১-১২৩৬ পর্যন্ত। রুকন উদ্দীন ফিরোজ শাহ ১২৩৬ খ্রি., সুলতানা রাজিয়া (১২৩৭-১২৪০ পর্যন্ত) ৩ বছর। বাহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২ খ্রি. পর্যন্ত) ২ বছর। মাসুদ শাহ ১২৪২-১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। নাসির উদ্দীন বলবন ১২৪৬-১২৬৬, গিয়াস উদ্দীন বলবন ১২৬৬-১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। কায়কোবাদ ১২৮৭-১২৮৯ পর্যন্ত। এই বংশে মোট ১২ জন শাসক ছিলেন। খিলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ পর্যন্ত) ৩০ বছর। তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ পর্যন্ত) ১০৭ বছর। মোট শাসক ৮ জন।

সৈয়দ বংশের শাসন ১৪১৪-১৪৫১ খ্রি. পর্যন্ত। সৈয়দ বংশের শাসক সংখ্যা ৪ জন। লোদী বংশের (১৪৫১-১৫২৬) শাসক সংখ্যা ৩ জন, মুঘল শাসন ১৫২৬-১৮৫৭ পর্যন্ত। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল শাসনের পরিসমাপ্তি হলেও নাম মাত্র শাসক ছিলেন, সর্বশেষ মুঘলদের শাসক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

প্রথম শাসক– ১। বাবর (১৫২৬-১৫৩০), ২। হুমায়ুন (১৫৩০-৪০), ৩। শেরশাহ (১৫৪০-১৫৫৫), হুমায়ুন ১৫৫৬-১৫৫৬, আকবর (১৫৫৬-১৬২৭), ৪। জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭), ৫। শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮), ৬। আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭), ৭। প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২), ৮। জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৭১৩), ৯। ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯), ১০। রফিউদ দারাজ ১৭১৯ খ্রি., ১১। রফউদ দৌলা দ্বিতীয় শাহজাহান (১৭১৯), ১২। মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮), ১৩। আহমদ শাহ (১৭৪৮-১৭৫৪), ১৪। আজিজুদ্দিন (১৭৫৪-১৭৫৯), ১৫। দ্বিতীয় শাহআলম, আলীগহর (১৭৫৯-১৮০৬), ১৬। দ্বিতীয় আকবর শাহ (১৮০৬-১৮৩৭), ১৭। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭/৫৮) মুসলিমদের একটানা ভারত শাসন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ।

আওরঙ্গজেবের পরে যারা ছিলেন তারা অনেকটাই দুর্বল, নামে মাত্র শাসক ছিলেন। ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রচলন মুসলিমরাই করে ছিলেন। যা মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ১৫২৬ সালে। পানিপথের যুদ্ধের মাধ্যমে তা শেষ হলো ১৮৫৭/৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। সর্বশেষ শাসক দ্বিতীয় বাহাদূর শাহের জীবনের শেষ পরিণিত ছিল খুবই করুন। ইংরেজরা তাঁকে এ দেশে থাকতে দেয়নি। নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটে আজকের মিয়ানমারের রেঙ্গুনে এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয় বলে জানা যায়। এরাই ছিল বিশ্বের এক সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক চেঙ্গিসখান ও তৈমুরলঙ্গের বংশধর। উত্থানপতন পৃথিবীর ইতিহাস। ❑

খুলনা জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সভা

গত ০৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে খুলনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যকরী পরিষদের সভা খুলনা সিটি আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় পবিত্র কুরআনে হাকীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। দরসে কুরআন পেশ করেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ জালাল উদ্দিন মাদানী এবং দরসে হাদীস পেশ করেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ আরাফাত মাদানী। এরপর আলোচ্যসূচি মোতাবেক সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন খুলনা জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ মইনুল ইসলাম। সদস্যদের উপস্থিতি পর্যালোচনা ও পরিচিতি পর্ব উপস্থাপন করেন জেলা জমঈয়ত সহকারী সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মঈন উল আরেফীন। বক্তব্য পেশ করেন জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি মাহবুব মোর্শেদ, দিঘলিয়া এলাকা জমঈয়ত সেক্রেটারি মুহাম্মদ জিয়াউল হক প্রমুখ। নির্ধারিত আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সভায় ইতোপূর্বে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি, জেনারেল কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়। **কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের বিবরণ নিম্নরূপ :**

সভাপতি- মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী। **সহ-সভাপতিবৃন্দ–** শাইখ আব্দুস সাত্তার কালাবগী, শাইখ মুহাম্মদ আরাফাত মাদানী, শাইখ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন মাদানী ও অধ্যাপক মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। সেক্রেটারি- মুহাম্মদ মইনুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ- তৌহিদুর রহমান হেলাল, সহকারী সেক্রেটারি- মঈন উল আরেফীন ও মুহাম্মদ রকিবুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক- মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, তালিম ও তারবিয়াহ্ সম্পাদক- শাইখ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- শাইখ মুহাম্মদ সোলায়মান, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- শাইখ মুস্তফা কামাল, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- হাফেয মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, পাঠাগার সম্পাদক- আখতার আহমদ খান, দফতর সম্পাদক- মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। **কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ–** মুহাম্মদ গোলাম রহমান, ডা. মুহাম্মদ আবুল বাশার, মুহাম্মদ আবু হানিফ, মুহাম্মদ আবু বকর, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, ডাক্তার মুজাহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ মোহাব্বত আলী, মুহাম্মদ সেকেন্দার আলী, মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, মুহাম্মদ সেলিম, সুলতান আহমাদ, মুহাম্মদ আব্দুল বারী, মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন, মুহাম্মদ জিয়াউল হক, মুহাম্মদ ওলিয়ার রহমান, মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মল্লিক, শেখ হাবিবুর রহমান।

নাটোর জেলা জমঈয়তের সম্মেলন

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার ধারাবারিষা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নাটোর জেলা জমঈয়তের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবের ইসলামী সেন্টারের দাঈ' শাইখ হাশিম মাদানী; কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী প্রমুখ। এতে নাটোর জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা সেক্রেটারি মুহাম্মদ নাজির হোসেন। স্থানীয় আলোচকদের মধ্য হতে বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ শাইখ মো. আব্দুল হক, উপাধ্যক্ষ শাইখ মোস্তাকুল হক, ড. এস. এম. শাজদার রহমান, অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল জব্বার, উপাধ্যক্ষ শাইখ আব্দুস সামাদ, শাইখ মঈন উদ্দিন, শাইখ ইদ্রিস আলী ও শাইখ আব্দুল মুতাকাব্বির প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যক্ষ শাইখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক সফর

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ হলিধানী আহলে হাদীস জামে মসজিদে সফর করেন। নেতৃবৃন্দ সেখানে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে হলিধানী এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ ইবরাহীম খলিলের উপস্থাপনায় ও জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মুহাম্মদ বজলুর রহমানের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে

অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সভায় কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সফল করার আহবান করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, শাখা জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার চৌরকোল এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। বিভিন্ন শাখা জমঈয়তের দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে চৌরকোল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর সমাগম ঘটে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে সকল মতভেদ ভুলে গিয়ে জমঈয়তের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খাঁন। বাদ জুমু'আহ্ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খানের সভাপতিত্বে, এলাকা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলামের উপস্থাপনায় ও চৌরকোল শাখা শুব্বানের সভাপতি মুহাম্মদ মুমিনুল ইসলামের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মী সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন পটুতলা শাখা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আসগর আলী, বেড়াশোল শাখার সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান, চৌরকোল এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (বকুল), জেলা জমঈয়তের তাবলিগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, জেলা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক আলী, সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। জেলা নেতৃবৃন্দ চৌরকোল উত্তরপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে সালাতুল আসর আদায় করেন এবং সালাতান্তে উপস্থিত মুসল্লিদের সাথে মতবিনিময় শেষে মহাসম্মেলন সফল করতে উদাত্ত আহ্বান জানান।

দু'আর আবেদন

ঝিকরগাছা-শার্শা, যশোর কোতোয়ালি ও চৌগাছা থানা নিয়ে গঠিত এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও বোধাখানা শাখা জমঈয়তের সভাপতি শেখ মুহাম্মদ ইবরাহীম ও তার সহধর্মিণী বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের সুস্থতা কামনা করে সকল মুসলিমকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পূর্ণ শেফা দান করুন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

০১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুর রহমান বি.এ.বি.টি ও প্রফেসর আবদুল গনী (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর ছোট ভাই, বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়িতের জন্য দু'আর আবেদন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং পরিবারের সদস্যদের সবরে জামিল দান করুন।

০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আবদুল আউয়াল আহমাদ-এর বোন গত ২২ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতের জন্য দু'আর আবেদন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং পরিবারের সদস্যদের সবরে জামিল দান করুন।

০৩. যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার দোর্মুটিয়া গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি, জমঈয়তে আহলে হাদীসের একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ মশিউর (৯০) রহমান গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাত আটটার সময় মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র, সাত কন্যা, আত্মীয় স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

পরদিন সকাল ১০টায় মাইয়্যেতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক মো. তৌহিদুল ইসলাম। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা মাইয়্যেতকে ক্ষমা করে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবূল করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সবরে জামিল দান করুন –আমীন।

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

ডায়াবেটিস : ওষুধ ছাড়াই নিরাময়

ডায়াবেটিস হচ্ছে বর্তমান সময়ের অন্যতম লাইফস্টাইল ডিজিজ। আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রতি ৯ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং প্রতি ৩ জনে একজন প্রি-ডায়াবেটিক। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের প্রতি ৩ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবে।

বাংলাদেশেও এ রোগের প্রকোপ হু হু করে বাড়ছে। এদেশে প্রতি ১০ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সপ্তম প্রধান কারণ ডায়াবেটিস। বিশ্বজুড়েই বিস্তৃত হয়েছে এর করাল থাবা। তাই ডায়াবেটিসকে এখন বলা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্লেগ।

ডায়াবেটিস কী?

প্রতিটি বাহনের জন্য প্রয়োজন জ্বালানি, যেমন- ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন ইত্যাদি। শরীররূপী আমাদের এই বাহনেরও জ্বালানি প্রয়োজন। শরীরের মূল জ্বালানি হচ্ছে গ্লুকোজ। আমাদের শরীরের যত ধরনের কাজ আছে– নড়াচড়া হাঁটা দৌড়ানো চিন্তা করাসহ সকল ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয় গ্লুকোজ। শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণের পর হজমশেষে গ্লুকোজ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তে প্রবেশ করে। ইনসুলিনের সাহায্যে গ্লুকোজ রক্ত থেকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিপাকক্রিয়ায় অংশ নিয়ে শক্তি তৈরি করে।

কোনো কারণে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারলে রক্তে গ্লুকোজ জমা হতে থাকে। ফলে রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যায়। একপর্যায়ে এই বাড়তি গ্লুকোজ কিডনি প্রস্রাবের সাথে বের করে দেয়। রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ কিন্তু কোষের মধ্যে গ্লুকোজ স্বল্পতা, আর প্রস্রাবে গ্লুকোজের উপস্থিতি- এই অবস্থার নামই ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ : বার বার ক্ষুধা লাগা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অবসন্নতা, ওজন কমে যাওয়া, অপুষ্টি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ঘটনাচক্রে অর্থাৎ- অন্য কোনো রোগের চিকিৎসায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে।

ডায়াবেটিস নির্ণয় করার উপায় : জেনে অবাক হবেন, আমাদের রক্তে যে পরিমাণ সুগার বা চিনি থাকে তার পরিমাণ মাত্র এক চা চামচ। আমরা যদি প্রতিদিন চা, কফি, কোমল পানীয়, মিষ্টান্ন, অন্য কোনো খাবারের সাথে ২-৩-৪-৫ চা চামচ চিনি খাই, তখন রক্তের সুগার বেড়ে দাঁড়ায় কয়েকগুণ। যা স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কারণ।

ডায়াবেটিসের ধরন : টাইপ– ১. ডায়াবেটিস : এক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় থেকে কোনো ইনসুলিন তৈরি হয় না। একমাত্র চিকিৎসা ইনসুলিন। এটি জীবনাচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

২. টাইপ– ২. ডায়াবেটিস : এ-ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন তৈরি হলেও শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা সৃষ্টির ফলে শরীর যথাযথভাবে ইনসুলিন ব্যবহার করতে পারে না। ভুল জীবনাচারের কারণে এটি হয়ে থাকে।

টাইপ– ৩. ডায়াবেটিস : কীভাবে হয় তা বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হবে কীভাবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। এ ব্যাপারে দু'টি তত্ত্ব আছে।

তত্ত্ব– ১ : আমরা যখন প্রাণিজ আমিষ এবং তৈলাক্ত-চর্বিযুক্ত খাবার খাই, তখন এই চর্বি শরীরে গিয়ে কোষে প্রবেশ করে। কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া তখন এই চর্বিকে পুড়িয়ে শক্তি তৈরি করে। কিন্তু অতিরিক্ত তৈলাক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ খাওয়া এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে কোষের ভেতর অধিক পরিমাণে এই চর্বি প্রবেশ করে, যা মাইটোকন্ড্রিয়া পুরোপুরি বার্ন-আউট করতে পারে না। ফলে তা কোষের মধ্যে জমতে থাকে। একপর্যায়ে এই সঞ্চিত চর্বি কোষের স্বাভাবিক কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

যদি কেউ আপনার দরজার লক-এ চুইংগাম ঢুকিয়ে দেয়, তখন আপনি যেমন দরজার লক খুলতে পারবেন না তেমনি কোষের ভেতর অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে ইনসুলিন তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। কেননা ইনসুলিন রিসেপ্টরের গায়ে চর্বির প্রলেপ জমে গেছে। অর্থাৎ- ইনসুলিন কোষের ভেতরে গ্লুকোজ প্রবেশে সাহায্য করতে পারে না, যা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা নামে পরিচিত।

তত্ত্ব– ২ : রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা) এবং চিনিসমৃদ্ধ খাবার (চা কফি জুস পিঠা পায়েশ মিষ্টান্ন ও কোমল পানীয় ইত্যাদি) খেলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে। লিভার এই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে লিভারেই জমা করে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমাইনো এসিড (আমিষের ক্ষুদ্রতম অংশ) রক্তে প্রবেশ করলে তা লিভার কর্তৃক প্রথমে গ্লুকোজ এবং পরে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে লিভারেই জমা হয়। যখন লিভারে আর গ্লাইকোজেন জমা হওয়ার জায়গা থাকে না, তখন লিভার অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বি বা ফ্যাটে (ট্রাইগ্লিসারাইড) রূপান্তরিত করে।

এই রূপান্তরিত ফ্যাট লিভার থেকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জমা হতে থাকে, বিশেষ করে মাংসপেশিতে এবং পেটের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গে ও এর চারপাশে। একটা পর্যায়ে এই অতিরিক্ত চর্বি লিভারেও জমা হতে থাকে। ফলাফল ফ্যাটি লিভার, যা প্রকারান্তরে তৈরি করে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হওয়ার পেছনে তত্ত্ব– ১ এবং তত্ত্ব– ২ দু'টোর ভূমিকাই থাকে।

টাইপ– ২. ডায়াবেটিসের কারণ : ⇨ স্থূলতা, ⇨ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, ⇨ অতিরিক্ত তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত, কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার, ⇨ রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা), ⇨ চিনিসমৃদ্ধ খাবার (চা কফি জুস পিঠা পায়েশ মিষ্টান্ন ও কোমল পানীয়), ⇨ প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ, ⇨ শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন কমে যাওয়া, ⇨ শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, ⇨ ক্রমাগত মানসিক চাপ বা স্ট্রেস।

ডায়াবেটিসের ক্ষতিকর প্রভাব : দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগলে যেসব রোগ হতে পারে তার মধ্যে করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ (৭৫ শতাংশ ডায়াবেটিসের রোগী উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত), স্ট্রোক, অন্ধত্ব, কিডনি রোগ, গ্যাংগ্রিন, ক্যান্সার অন্যতম।

টাইপ– ২. ডায়াবেটিসের প্রচলিত চিকিৎসা : বিশ্বব্যাপী যত ডায়াবেটিস রোগী আছে তার ৯০ শতাংশই আক্রান্ত টাইপ– ২. ডায়াবেটিসে। প্রচলিত চিকিৎসায় বলা হয়, এ রোগ ভালো হয় না। যেহেতু ডায়াবেটিস রোগে রক্তের সুগার লেভেল সহজেই বেড়ে যায়, তাই এর চিকিৎসায় চিনি ও শর্করা জাতীয় খাবার, মিষ্টি ফল ইত্যাদি কম-পরিমিত খেতে বলা হয় যেন রক্তের সুগার লেভেল বেড়ে যেতে না পারে। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে, মিষ্টি জাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণ করার পরও ডায়াবেটিস উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। রক্তের এই বাড়তি সুগার কমানোর জন্য তখন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।

এত কিছুর পরও সুগার নিয়ন্ত্রণ না হলে একপর্যায়ে ইনসুলিন দেয়া হয়। কিন্তু দেখা যায়, প্রচলিত নিয়ম মানার পরও রক্তের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ হয় না। ফলে ইনসুলিনের ডোজ বাড়তে থাকে। আবার ইনসুলিন নেয়ার পর শর্করা জাতীয় খাদ্যের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। কেননা একটু এদিক-ওদিক হলে রক্তের সুগার লেভেল অতিরিক্ত কমে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থা (হাইপোগ্লাইসেমিয়া) সৃষ্টি হতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি : জীবনদৃষ্ট ও জীবনাচার পরিবর্তন করে যে ডায়াবেটিস নিরাময় করা যায়– এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মেডিসিন বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ডা. নিল বার্নার্ড। এ গবেষণায় আরো এগিয়ে আসেন ডা. জোয়েল ফুরম্যানসহ অন্যান্য গবেষকরা। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনাচারে আমূল পরিবর্তন এনে তারা ডায়াবেটিস নিরাময় করতে সক্ষম হন।

তাদের প্রোগ্রাম অনুসারে ডায়াবেটিস নিরাময়ে করণীয় বর্জন করুন (কমপক্ষে একবছর) : ⇨ মাছ মাংস ডিম দুধ, ⇨ তেল ঘি মাখন ডালডা মার্জারিন, ⇨ তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত ভাজাপোড়া খাবার, ⇨ চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা, ⇨ প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার।

প্রতিদিন খান : ⇨ **পূর্ণ শস্যদানা :** লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি এবং এর পরিমাণ হবে খুবই কম। চাইলে ভাত বা রুটির পরিবর্তে খুব অল্প পরিমাণে লাল ওটস খেতে পারেন। ⇨ শাকসবজি, সালাদ ও সবুজ পাতা : হতে হবে পর্যাপ্ত। ⇨ ডাল মটরশুটি বিন বীজ : পরিমিত ও নিয়মিত। ⇨ ফল : প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ ধরনের টক ও কম মিষ্টি ফল খান এবং ওষুধ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বেশি মিষ্টি ফল, যেমন- খেজুর, আম, কাঁঠাল, তরমুজ, লাল আপেল ইত্যাদি বন্ধ রাখুন।

এছাড়াও ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন–

⇨ খুব অল্প পরিমাণ আখরোট কাঠবাদাম এবং তিসি চিয়া তিল সূর্যমুখী ও মিষ্টিকুমড়ার বীজ, সয়াদুধ। ⇨ প্রতিদিন সকালে ১ গ্লাস করে কাঁচা করলার জুস, মেথি ভিজানো পানি ও ট্যাঁড়শ ভিজানো পানি এবং রাতে ৩ চা চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার। ⇨ প্রতিদিন কিছু দারুচিনি, ১ কাপ হার্বাল চা ও ৩-৪ কাপ গ্রিন টি।

এছাড়াও ডায়াবেটিসের রোগীরা যা যা করবেন–

⇨ প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যায়াম। ব্যায়াম ইনসুলিনের প্রতি শরীরের কোষগুলোর সংবেদনশীলতা বাড়ায়, ফলে ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজকে কোষের ভেতরে প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়। এছাড়াও ব্যায়ামের ফলে সৃষ্ট পেশিসংকোচন গ্লুকোজ পরিবহণ বাড়ায়, যা ইনসুলিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। অর্থাৎ- ইনসুলিনের সহযোগিতা ছাড়াই গ্লুকোজ কোষে প্রবেশ করে। তাই ব্যায়াম করলে ব্লাড সুগার লেভেল বেশ কিছুটা কমে। ফলে ডায়াবেটিস দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ⇨ প্রতিদিন দুই বেলা মেডিটেশন। ⇨ প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ দফা প্রাণায়াম। ⇨ প্রতিদিন কিছু সময় সূর্যস্নান। ⇨ সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন রোযা/উপবাস/ফাস্টিং। *[সূত্র : একুশে টেলিভিশন অনলাইন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : *ইদানিং খুব বেশি একটা মোবারকবাদ পোস্ট করতে দেখি, তা হলো– 'জুম্মা মোবারক'। খুব পবিত্র মনেই এই মোবারকবাদ দেয়া হয়। আমার প্রশ্ন হলো– এই জুম্মা শব্দটা কি সঠিক উচ্চারণ, আর জুম্মা মোবারক পোস্ট করা বা বলা যাবে কি?*

নুমান বিন ইসমাঈল, বাসাব, ঢাকা।

জবাব : সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ জুমু'আর দিন। কুরআনুল কারীম-এর অন্যতম সূরার নাম 'সূরাতুল জুমু'আ'। এ সূরার ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ দিনকে জুমু'আহ্ বলেছেন। কাজেই সঠিক উচ্চারণ হবে 'জুমু'আহ্'; জুম্মা নয়। এ দিনটির বিশেষণ হিসেবে 'মুবারক' শব্দের ব্যবহার কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইসলামী পরিভাষায় নতুন কিছু সংযোজন বিদআত। অতএব এ বিশেষণের যত্রতত্র ব্যবহার হতে বিরত থাকা উচিত। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : *আমরা যে দরূদ পড়ি– "আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা সাইয়্যেদিনা... ওয়াসাল্লাম"। এই দরূদ কি সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ কখনো পাঠ করেছেন, এই দরূদ সহীহ কি?* *মো. ফকরুল ইসলাম, বরিশাল।*

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি মাসনূন তরীকায় যে দু'আ করা হয়, তাকে সালাত ও সালাম বলা হয়। সালাত-এর ফারসি পরিভাষা হচ্ছে 'দরূদ'। দু'আ একটি 'ইবাদত; বরং 'ইবাদতের সারাংশ। আর 'ইবাদত অবশ্যই রাসূল (ﷺ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে হতে হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অবগত হওয়া যায় যে, প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যসমষ্টি কোনো বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বিধায় এটি বিদ'আত। আর যা বিদ'আত, তা পরিতাজ্য– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)***। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *আমি জানি সহীহুল বুখারী'র ৮৮২ নম্বর হাদীসে দেওয়া আছে জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে সে উট সাদাক্বার সওয়াব পাবে, পর্যায়ক্রমে গরু, মুরগী, ডিম সাদাক্বার সওয়াব পাবে। আমার প্রশ্ন হলো– মুয়াজ্জিন তো জুমু'আর দিনে প্রথমে আসে তবে কি মুয়াজ্জিন ঐ প্রথম ব্যক্তির সওয়াব পাবে, নাকি মুয়াজ্জিনের পরে যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে সে ঐ সওয়ার পাবে? কেননা মুয়াজ্জিন তো বেতনভুক্ত কর্মচারী, তাকে তো তার দায়িত্ব পালন করতে আসতেই হবে। এক্ষেত্রে মুয়াজ্জিন কি প্রথম ব্যক্তির উট সাদাক্বার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে?*

আব্দুল মাজেদ, বড় দূর্গাপুর, সদর গাইবান্ধা।

জবাব : হাদীসে বর্ণিত ফযীলত বা মর্যাদা কেবল ঐ ব্যক্তিই পাবেন, যিনি উক্ত সাওয়াব লাভের আশায় মসজিদে গমন করবেন। যার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। মুয়াজ্জিন মসজিদের খিদমতে বা আযান দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করলে তিনি এ সাওয়াব পাবেন না। তবে যদি তিনি এ সাওয়াব লাভের আশায় প্রত্যুষে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায়করত কুরআন তিলাওয়াত বা অন্যান্য দু'আ ও যিক্র করতে থাকেন, অতঃপর এর ফাঁকে আযানের ন্যায় গুরু দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে তিনিও উক্ত সাওয়াব পেয়ে ধন্য হতে পারেন। শুধু কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করলে এ সাওয়াব পাওয়া যাবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : *আমরা এ যাবৎ জেনে আসছি যে, ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়িয নয়। আমরা প্রশ্ন হলো, ওযূ ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কী? বিষয়টির দলীলসহ সঠিক সমাধান জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।*

লিয়াকত আলী, কক্সবাজার।

জবাব : ওযূ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াতে কোনো বাধা নেই। তবে মূল কুরআন ধরে পড়তে চাইলে ওযূ করে নিয়ে তার পর পড়া উচিত। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○ تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"পূত পবিত্র ছাড়া তা স্পর্শ করতে পারবে না। জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।" ***(সূরা আল ওয়াক্বি'আহ্ : ৭৯ ও ৮০)***

সাহাবী 'আম্র ইবনু হাজ্জ যমকে (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

"পবিত্রতা ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" ***(মু'আত্ত্বা ইমাম মালেক- হা. ২৩৪, মিশকাত- হা. ৪৬৫ ও সুনান দারেমী- হা. ২২৬৬ [এটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হলেও এর সমর্থনে শাহেদ বিদ্যমান থাকায় এবং আল-কুরআনের নির্দেশের আলোকে হওয়ায় এটি 'আমলযোগ্য])***

আর এর উপরই সাহাবা (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-গণের 'আমল রয়েছে। কাজেই মূল কুরআন ওযূ করে স্পর্শ করা উচিত। –ওয়াল্লাহু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমাদের এলাকায় মহিলারা কুরআন খতম করে মসজিদ বা মাদ্‌রাসার হুজুরদের কাছে বলেন, আমি ২/৩ বার কুরআন খতম করেছি আমার মৃত মা/বাবার নামে আপনারা বাসায় এসে তাদের নামে দু'আ করে বকসে দিয়ে যান। সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা ও কিছু হাদিয়া গোপনে হাতে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এ রকম করা জায়িয আছে কি? প্রশ্ন হলো– এ সমস্ত আলেমগণ যদি অন্যের কুরআন পড়ার সওয়াব বকসে দিতে পারেন তাহলে বেআলেম মানুষেরা আমাদের সমস্ত পাপগুলো কারো বাবা মার নামে ট্রান্সপার/বকসে দিতে পারবে কি?***

মো. ফকরুল ইসলাম
গৌড়নদী, বরিশাল।

জবাব : কুরআন বেশি বেশি পড়া বড়ো সাওয়াবের কাজ। সাধ্যমত একাধিকবার পুরো কুরআন পড়া অতি উত্তম 'আমল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার কুরআন পড়লে এক খতম বলা হয়। যিনি কুরআন পড়বেন তিনি সাওয়াব পাবেন। আর তিনি নিজে কুরআন পড়ার ন্যায় সাওয়াবের কাজকে ওয়াসিলা করে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তা কবুল হয়– ***(সহীহুল জামে'- আল-বানী, হা. ১৫০)***। কিন্তু অন্যকে ভাড়া করে এনে দু'আ করানো কোনোভাবে শরিয়তসম্মত নয়। তাছাড়া কেউ কারো সাওয়াব নিয়ে নিতে পারে বা অপরকে বখশিয়ে দিতে পারে– এমনটি অবাস্তব ও অকল্পনীয়। এটি সূফীদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের অংশ বিশেষ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেন : "কোনো বহণকারী অন্যের (পাপের) বোঝা বইবে না"– ***(সূরা আল ফা-ত্বির : ১৮)***। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***বাথরুমে দু'আ পড়ে যাওয়ার পরে যদি বাথরুম করতে খুবই কষ্ট/বিপদ হয় তাহলে কি বাথরুমে মহান আল্লাহর নাম করা অথবা দু'আ ইউনুস পড়া যাবে কি বাথরুমে বসা অবস্থায়?*** *মো. ইয়াহইয়া*
মাধবকটি, সাতক্ষীরা।

জবাব : পেশাব-পায়খানার জায়গাকে বাইতুল খালা বা নির্জন কক্ষ বলা হয়। এখানে প্রবেশের পর কোনো প্রকার যিক্‌র-আযকার করা যাবে না। তবে কোনো বিপদ দেখলে মনে মনে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার জন্য যে কোনো দু'আ পাঠ করতে পারবে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***খতম তারাবীতে দু'জন হাফেয মিলে কুরআন মাজিদ খতম করেন। হাফেয সাহেবরা খুব দ্রুত তিলাওয়াত করার কারণে মুসল্লীরা তিলাওয়াত বুঝতে পারে না। এমতাবস্থায় মুসল্লিদের কি কুরআন খতমের সওয়াব হবে, নাকি শুধু ইমামের হবে?*** *মো. সানাউল্লাহ*
গুরুদাসপুর, নাটোর।

জবাব : তারাবীহ মানে তাড়াতাড়ি নয়; বরং ধীরস্থিরভাবে দীর্ঘ সময় তিলায়াত ও দীর্ঘ রুকূ'-সিজদার মাধ্যমে এ সালাত সম্পন্ন করা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বলিষ্ঠ সুন্নত। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন : "রাসূল (ﷺ)-এর সালাত কতো দীর্ঘ ও সুন্দর ছিল সে ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করো না"– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪৭; সহীহ আন্ নাসায়ী- হা. ১৬৯৬)***। অর্থাৎ- তাঁর (ﷺ) সালাতের ধীরস্থিরতা ও সুন্দর্যের বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো!"– ***(সূরা আল মুয্‌যাম্মিল : ৪)***। অতএব কুরআন পড়া বুঝা না গেলে সাওয়াবতো দূরের কথা; গুনাহের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মনে রাখতে হবে– তারাবীহ সালাতে কুরআন সুন্দরভাবে পড়া ও শুনা উদ্দেশ্য; তাড়াহুড়া করে খতম পুরা করা উদ্দেশ্য নয়। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাতেও কি "তাওয়াররুক" করতে হবে? আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি কোনো কোনো শাইখ বলছেন, শুধু চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের শেষ বৈঠকে "তাওয়াররুক" করতে হবে। দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাতে "তাওয়াররুক" করা যাবে না। সহীহ পদ্ধতি জানতে চাই।*** *মো. সানাউল্লাহ*
গুরুদাসপুর, নাটোর।

জবাব : 'তাওয়ার্‌রুক' হলো সালাতের তাশাহহুদে বসার বিশেষ পদ্ধতির নাম। আর তা হলো– ডান পা খাড়া করে সে পায়ের নলার নীচ দিয়ে বাম পা বের করে নিতম্বের উপর বসা। যে সালাতে দু'টি বৈঠক আছে, তার শেষ বৈঠকে তাওয়ার্‌রুক করা সুন্নত। তাছাড়া দু'রাকআত বিশিষ্ট সালাতেও তাওয়ার্‌রুক করা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমণিত। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৮২৭ ও সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৬২, সহীহ)***

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***মহিলারা বাড়িতে একাকী ফর্‌য সালাতে ইকামাত দিয়ে সালাত শুরু করবে কি?*** *মো. আজহারুল হক*
পণ্ডিত বাড়ি, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

জবাব : মহিলাগণ নিজ গৃহে একাকী ফর্‌য সলাত আদায়কালে ইকামত দিয়ে সলাত আদায় করবে কিনা? সে বিষয়ে ইখতিলাফ বিদ্যমান। মহিলাগণের আযান ও ইকামাত না দেয়ার পক্ষে নিম্নোক্ত দলীল বিদ্যমান :

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ اَذَانٌ وَلَا اِقَامَة.

"নারীগণের উপর আযান ও ইকামাতের বিধান নেই"– ***(নায়লুল আওতার- হা. ১১, সনদ সহীহ)***। শায়খ বিন বায (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আযান ও ইকামতকে

পুরুষের জন্য শরিয়তসম্মত করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)'র আযান ও ইকামত বলা বিষয়ক হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা অবগত নই– *(ফাতওয়া নূরুন আলাদ দারব- ৬/৩৫২-৩৫৩)*। জমহুর সালাফ ও ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে নারীদের জন্য আযান ও ইকামাত ওয়াজিব নয়– *(সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/২৭৪ পৃ.)*। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন, নারীদের একাকী সলাতে ইকামাত বলা বৈধ রয়েছে। *(ইসলাম ওয়েব- ফাতওয়া, ৬৯৯৫৪)*

জিজ্ঞাসা (১০) : ***সালাতের মাঝে ও শেষ বৈঠকের সময় আত্তাহিয়্যাতু, তাশাহুদ, দরুদ পড়ার সময় অনামিকা আঙ্গুল দ্বারা সব সময় ইশারা করা, নাকি লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলার সময় একবার উঠিয়ে নামিয়ে ফেলা, কোনটি সঠিক? দয়া করে দলিলসহ জানাবেন।*** *আব্দুল্লাহ, ঢাকা।*

জবাব : সলাতের প্রথম ও শেষ উভয় বৈঠকে শাহাদাত আঙুল দিয়ে পূর্ণ সময় ইশারা করা এবং তাশাহহুদ, দরুদ ও দু'আকালীন শাহদাত আঙ্গুল নাড়ানো বিশুদ্ধ হাদীস থেকে প্রমাণিত 'আমল। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাশাহুদের জন্য বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তিপ্পান্ন গণনার অবস্থার ন্যায় হাতের (ডান) তর্জনী (শাহাদাত আঙুল) ছাড়া আঙুলগুলোকে গুটিয়ে নিতেন এবং তর্জনী আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন– *(সহীহ মুসলিম, বুলুগুল মারাম- হা. ৩০৯)*। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– নবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশাহহুদকালে হাতের আঙুলগুলোকে গোলাকৃতি করে নিতেন, অতঃপর তাঁর আঙুল (শাহাদাত) উঠাতেন; আমি তাঁকে দেখেছি তিনি তা নাড়াচ্ছেন এবং তা দিয়ে দু'আ করছেন– *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৮৮৯০; সুনান আন্ নাসায়ী- আলবানী সহীহ বলেছেন)*। সুতরাং স্পষ্ট হলো– সলাতের প্রথম ও শেষ বৈঠকে তর্জনী বা শাহাদাত আঙুল দিয়ে পূর্ণ সময় ইশারা করা। তা নাড়িয়ে দু'আ করা সুন্নাহ স্বীকৃত বিশুদ্ধ 'আমল। তবে শুধু ইশারা করে রাখার হাদীসও রয়েছে। *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৭৩)*

জিজ্ঞাসা (১১) : ***মহিলাদের কবর যিয়ারতের হুকুম কী? জানিয়ে উপকৃত করবেন।*** *আরমান, সোনাতলা, বগুড়া।*

জবাব : মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারাত জায়িয হওয়া বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। মহিলাদের জন্য বেশি বেশি কবর যিয়ারাত করা অভিশাপযোগ্য কাজ।

لَعَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ (وفي لفظ لعن الله) زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

"বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারীণীদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (অপর বর্ণনায় আছে আল্লাহ তা'আলা) অভিশাপ দিয়েছেন।" *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৫৬)*

সীমিত আকারে নারীদের কবর যিয়ারত করা বৈধ রয়েছে সহীহুল বুখারী (হা. ১২৫২), সহীহ মুসলিম (হা. ৯৭৪), মুসনাদ আহমদ (হা. ২৫৩২৭), বায়হাক্বী (৪/৭৮) প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার আত্ তালখীস গ্রন্থে মহিলাদের কবর যিয়ারত করার বৈধতার দলিল গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন হাদীসের আলোকে– *(আত্ তালখীস- ইবনু হাজার আসকালানী, ৫/২৪৮)*। সুতরাং মহিলাদের কবর যিয়ারত পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয়; তবে বেশি বেশি কবর যিয়ারত মহিলাদের জন্য লানতযোগ্য কাজ।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***আমাদের মসজিদটি আনুমানিক ৩৩/৩৪ বছর আগে নির্মিত। সেখান হতে জুমু'আর দিন দুই আযান প্রচলিত। বর্তমানে আমাদের খতিব সাহেব বলছেন, দুই আযান দেয়া রাসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের বিপরীত। হাদীসসম্মত উত্তর দানে বিষয়টির ফায়সালা করবেন ইন্শা-আল্লাহ।*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

জবাব : আপনার মাসজিদে জুমু'আর দিন ২টি আযান প্রচলিত আছে। এই 'আমল সঠিক রয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। এমন নয় যে, আবশ্যিকভাবে দু'আযানকে এক আযান করতে হবে। ইমাম জুমু'আর দিনে খুতবার জন্য বসলে যে আযান হয় এটিই জুমু'আর মূল আযান। মানুষ জনের যথা সময়ে জুমু'আয় আগমনের সুবিধার্থে 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) উল্লেখিত আযানের পূর্বে আরেকটি আযানের প্রবর্তন করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯১২)*। লোক সংখ্যার আধিক্যের কারণে এবং মানুষের ব্যস্ততার নিরীখে অবগত করিয়ে দেয়ার নিমিত্তে এই আযান 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) চালু করেন। 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর প্রবর্তিত এই আযান শরিয়াহসম্মত। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

عَلَيْه بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ.

"তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মেনে নেয়া কর্তব্য"– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৬০৭; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৭৬, হাসান সহীহ)*। সুতরাং ইমাম মিম্বারে বসার পরে প্রদত্ত আযান তা ওয়াজিব হিসাবে যথাযথ পর্যায়ে রেখে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর প্রবর্তিত দ্বিতীয় আযান জুমু'আর দিনে বৈধ রয়েছে, তা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***আমাদের দেশের অনেক আলেম বলেছেন– যাবতীয় কমল পানি হারাম, কারণ তাতে এলকহোল আছে। এদিকে আমার এক বন্ধু যিনি সৌদি আরব আলকাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত, তিনি বলছেন, এই সব কমল পানি যে হারাম তার প্রমাণ কী?***

অতএব এই সব পানীয় খাওয়া জায়িয কী না জায়িয সঠিকটা জানালে উপকৃত হতাম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : অ্যালকোহলযুক্ত কোমল পানীয় অবশ্যই হারাম হবে। কারণ হলো তা মাদকীয় বস্তু। কোমল পানীয়তে অ্যালকোহল আছে কি না- তা উৎপাদনের উপাদান এবং উপাদানের সাংকেতিক কোড দেখে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তা নিশ্চিত হয়ে আপনি কোমল পানীয় পান করুন অথবা বর্জন করুন। তবে অ্যালকোহলের সামান্য মিশ্রণ থাকলেও কোনো পানীয় পান করা যাবে না। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُه حَرَامٌ.

"যার অধিকে নেশা হয় তার অল্পও হারাম"– *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৮৬৫, আলবানী সহীহ)*। অ্যালকোহল থাকার নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলে স্বাভাবিকভাবে কোনো খাদ্য-পানীয় হালালই থাকবে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– "তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীতে যা আছে তার সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"– *(সূরা আল বাক্বারাহ : ২৯)*। সুতরাং দলিল প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু হারাম করা যাবে না।

জিজ্ঞাসা (১৪) : স্বামী ও স্ত্রী বাড়িতে বিশেষ প্রয়োজনে ফর্‌য সালাত জামাআত করে আদায় করতে গেলে স্বামী স্ত্রীর পাশাপাশি দাঁড়াবে, না স্বামীর পিছনে স্ত্রী দাঁড়াবে?

মো. আজহারুল হক
আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

জবাব : স্বামী-স্ত্রী মিলিতভাবে জামাআতে সলাত আদায় করলে স্বামী সামনে দাঁড়াবে এবং বরাবর পেছনে দাঁড়াবে স্ত্রী। পরস্পর বরাবর ডানে বামে দাঁড়াবে না। নারী-পুরুষ জামা'আতে সামনে পিছনে দাঁড়াবে এমন কি মাতা ও কন্যা হলেও। এই মর্মে বিশুদ্ধ হাদীসের প্রমাণ হলো– আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ، أَوْ خَالَتِهِ»، قَالَ : «فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا».

"অনাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) তাঁর মা সমেত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাত পড়ালেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর ডানপাশে এবং নারীকে (খালা) পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন"– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১০৫৬)***। সুতরাং আপনার জন্য করণীয় হলো স্বামী-স্ত্রীতে কখনো জামা'আত করলে স্ত্রীকে আপনার পেছনে দাঁড় করাবেন।

জিজ্ঞাসা (১৫) : কোনো মহিলা যখন তার থেকে প্রবাহিত রক্তের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারবে যে, এটি কি হায়েযের রক্ত, না কি ইস্তেহাযার রক্ত না কি অন্য কিছুর, তখন সে কী করবে? *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

জবাব : মহিলাদের পবিত্রতা সম্পর্কিত বিষয়টি আসলেই পুরুষদের থেকে অনেকটা আলাদা ও ব্যতিক্রম। মহিলাদের জরায়ু থেকে বিভিন্ন শ্রেণির রক্ত নির্গত হয়ে থাকে। তাই তাদের থেকে নির্গত রক্তের হুকুমও বিভিন্ন রকম। মোটের উপর আমরা বলতে পারি, সেটা হায়েযেরই রক্ত। যতক্ষণ না সেটা অন্য রক্ত বলে প্রমাণিত হবে এবং মহিলা তা চলাকালে সালাত, সিয়াম ও স্বীমার সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকবে। তবে যখন প্রমাণিত হবে যে, সেটা ইস্তেহাযার রক্ত, অথবা অন্য রক্ত, তখন ইস্তেহাযা হিসেবে অথবা অন্য রক্ত হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং নির্গত রক্তকে হায়েযের রক্ত হিসেবেই গণ্য করবে। যতক্ষণ না তা ইস্তেহাযা বা অন্য কিছুর রক্ত হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। যখন প্রমাণিত হবে যে, এটা অন্য রক্ত, তখন সালাত ও সিয়াম শুরু করবে। স্বামীর সাথে মিলনও করতে পারবে।

জিজ্ঞাসা (১৬) : কত বছর বয়স হলে সিয়াম রাখা ফর্‌য? জানিয়ে উপকৃত করবেন।

মুখলেসুর রহমান
বাঘারপাড়া, যশোর।

জবাব : বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই সিয়াম ফর্‌য হয়ে যায়। ছেলেদের বেলায় লজ্জাস্থানের চতুর্পার্শ্বে লোম উদ্গত হওয়া কিংবা প্রথম স্বপ্নদোষ হওয়া তার প্রাপ্ত বয়স্ক প্রমাণিত হওয়ার দলিল। আর মেয়েদের বেলায় প্রথম 'হায়েয' বা মাসিক পিরিয়ড হওয়া বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আলামত। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ.

"তিন শ্রেণির মানুষ হতে ক্বলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ- তারা শরিয়তের মুকাল্লাফ নয়। আর তারা হলেন : (এক) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হবে, (দুই) শিশু, যতক্ষণ না স্বপ্নদোষ হবে এবং (তিন) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হবে কিংবা জ্ঞান ফিরে পাবে।" ***(মুসনাদে আহমাদ- হা. ১১৮৩, সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৪০১, সহীহ, ইরওয়াউল গালীল- আল-বানী, হা. ২৯৭)***

উল্লেখ্য যে, মেয়েদের বালেগ হওয়ার বয়স ৯ বছর বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন। কেননা, এ বিষয়েই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)'র সাথে বাসর করেছিলেন। কাজেই মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। –ওয়াল্লাহু 'আলাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

ভারতের হায়দ্রাবাদে ঐতিহাসিক মক্কা মসজিদ

–আবু ফাইয়ায

'মক্কা মসজিদ' কিন্তু বাস্তবে এটি সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কার কোনো মসজিদ নয়। আলোচিত এই মসজিদটি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ জেলায় অবস্থিত। নামকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, মসজিদটির মূল ভবনের ইট তৈরির জন্য মাটি আনা হয় সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা থেকে। তাই মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে 'মক্কা মসজিদ'। মসজিদটি ভারতের বৃহৎ ও প্রাচীন মসজিদগুলোর একটি এবং ভারতে তেলেঙ্গানায় হায়দ্রাবাদ জেলায় অবস্থিত এ মসজিদটি পুরাতন হায়দ্রাবাদ শহরের একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, যার অতি সন্নিকটে ঐতিহ্যবাহী চৌমহল্লা, লাদ বাজার ও চারমিনার অবস্থিত।

কুতুব শাহি সাম্রাজ্যের পঞ্চম শাসক মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ মসজিদটি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মসজিদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং পুরো শহরের পরিকল্পনাকারী ছিলেন তিনি। মসজিদটির সামনের খিলানগুলো গ্রানাইডের টুকরা দিয়ে নির্মিত। এগুলো নির্মাণে সময় লেগেছে পাঁচ বছর। মসজিদটি নির্মাণে পাঁচ হাজার শ্রমিক অংশ নেন। মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করেন মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ। পরে মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব হায়দ্রাবাদ জয়ের পর মসজিদটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন।

সালাতের জন্য মসজিদের প্রধান কক্ষটির দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট। প্রস্থ ২২০ ফুট এবং উচ্চতা ৭৫ ফুট। একসাথে ১০ হাজার মুসল্লি এই মসজিদে সালাত আদায় করতে পারেন।

মসজিদটির প্রধান নামায-কক্ষটির ছাদ স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি খিলানের ওপর। এই ১৫টি খিলান সাজানো হয়েছে তিনটি সারিতে, আর প্রতিটি সারিতে রয়েছে পাঁচটি করে খিলান। মসজিদের প্রধান স্থাপনা দু'টি বিশাল অষ্টাভুজাকৃতির কলাম দ্বারা সংগঠিত। প্রতিটি কলাম তৈরি করা হয়েছে একটিমাত্র গ্রানাইডের টুকরা দিয়ে। মসজিদের মূল ভবনের ছাদের চার দেয়ালের বাইরের অংশ গ্রানাইড ব্লক দিয়ে আবরণ দেয়া। এই মসজিদের স্থাপনার সাথে ঐতিহাসিক চারমিনার ও গোলকন্দা দুর্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মক্কা মসজিদটি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তালিকাভুক্ত ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা। দীর্ঘদিন এটা রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং দূষণের ফলে এই ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার অনেক অংশ নষ্ট হয়ে যায় ও ভেঙে যায়। ১৯৯৫ সালে এই স্থানে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হয়। তাই ভবিষ্যতে এই স্থাপনাটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অন্ধ্র প্রদেশ সরকার ২০১১ সালের আগস্ট থেকে যানবাহনমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২০০৭ সালের ১৮ মে জুমার নামাজের সময় এই মসজিদের অভ্যন্তরে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী হামলা ঘটে যাতে কমপক্ষে ১৩ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়।

মক্কা মসজিদ সপ্তাহের সব দিন ভোর ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ বিনামূল্যে তবে দর্শনার্থীদের ড্রেস কোড মেনে চলতে হবে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। মসজিদ এবং এর সৌন্দর্য সর্বদা ফটোগ্রাফারদের চোখকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু ফটোগ্রাফি শুধুমাত্র প্রধান 'ইবাদতগাহের বাইরে অনুমোদিত, যার মানে হলো যে, আপনি শুধুমাত্র আপনার হৃদয়ে এই সেরা স্মৃতিস্তম্ভের মুগ্ধকর দর্শনীয় স্থানগুলোকে ক্যাপচার করতে পারেন। *[সূত্র : উইকিপিডিয়া, নয়া দিগন্ত অনলাইন প্রভৃতি]*

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিঃ) বলেন :

«إذا صح الحديث فهو مذهبي».

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ! সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।" **(ইবনু আ'বিদান- আল বাহর আর রায়িক-এর হাশিয়ায়- ১/৩৬ পৃঃ এবং রাসমুল মুফতী- ১/৪ পৃঃ, শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৬২ পৃঃ)**

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
রামাযান-১৪৪৪ হি./২০২৩ ইং সালের
সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী
(ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামাযান	মার্চ-এপ্রিল			
০১	২৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
০২	২৫ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১১
০৩	২৬ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
০৪	২৭ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১৩
০৫	২৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১৩
০৬	২৯ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৩৮	০৬ : ১৩
০৭	৩০ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৪
০৮	৩১ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
০৯	০১ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ৩৪	০৬ : ১৪
১০	০২ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ৩৩	০৬ : ১৫
১১	০৩ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ৩২	০৬ : ১৫
১২	০৪ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ৩১	০৬ : ১৬
১৩	০৫ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ৩০	০৬ : ১৬
১৪	০৬ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২৯	০৬ : ১৭
১৫	০৭ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২৮	০৬ : ১৭
১৬	০৮ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ২৭	০৬ : ১৮
১৭	০৯ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ২৬	০৬ : ১৮
১৮	১০ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ২৫	০৬ : ১৯
১৯	১১ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ২৪	০৬ : ১৯
২০	১২ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ২৩	০৬ : ১৯
২১	১৩ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২২	০৬ : ২০
২২	১৪ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২০	০৬ : ২০
২৩	১৫ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১৯	০৬ : ২০
২৪	১৬ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ১৮	০৬ : ২১
২৫	১৭ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ১৭	০৬ : ২১
২৬	১৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ১৬	০৬ : ২২
২৭	১৯ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ১৫	০৬ : ২২
২৮	২০ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ১৪	০৬ : ২২
২৯	২১ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ১৩	০৬ : ২৩
৩০	২২ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১২	০৬ : ২৩

{আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ইসলামিক ফাইন্ডার (ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী) এর সময় সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত}

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য

ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ৪২ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ০০ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ৪৮ সে.	(−) ০১ মি. ৩০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০১ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ০০ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৭ মি. ৩০ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.
২১	বান্দরবন	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৭ মি. ৩৬ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	(−) ০৬ মি. ৩৬ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০২ মি. ৩৬ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০১ মি. ৩৬ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ১২ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ০৬ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৪৮ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	(−) ০৩ মি. ৪২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
৩৫	বাগেরহাট	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.
৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.
৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.
৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.
৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.
৪৫	পিরোজপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
৪৬	পটোয়াখালী	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ১২ সে.
৪৭	বরগুনা	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.
৪৮	ভোলা	(−) ০০ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.
৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৬ মি. ৪৮ সে.
৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ১৮ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ১৮ সে.
৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.
৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৬ মি. ১৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.	(+) ০৭ মি. ৪২ সে.
৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
৬০	রংপুর	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৩০ সে.
৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৩ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
৬৩	নীলফামারী	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.
৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ২৩ মার্চ-২০২৩ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী